দাম : বারো টাকা

স্বস্তিকা

৭৩ বর্ষ, ৫ সংখ্যা।। ১৪ সেপ্টেম্বর, ২০২০।। ২৮ ভাদ্র - ১৪২৭
যুগাব্দ ৫১২২।। website : www.eswastika.com

‘রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র, জীবনানন্দ,
কাজী নজরুলের বাংলা ভাষা ফিরিয়ে দাও’

পশ্চিমবঙ্গ মাতৃভাষা দিবসের পটভূমি

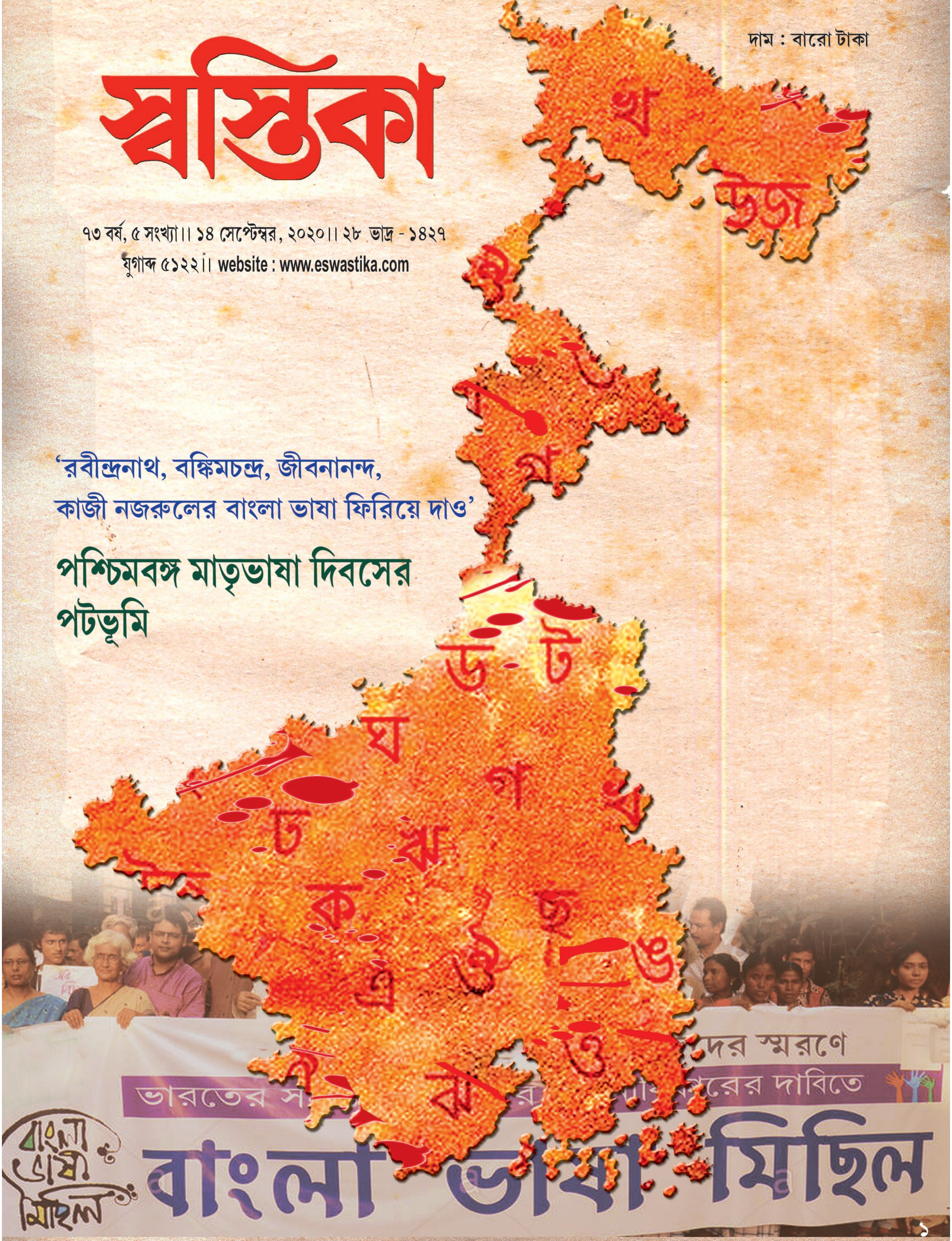

CENTURYPLY®

CENTURYPLY®
CENTURYLAMINATES®
CENTURYVENEERS®
CENTURYPRELAM®
CENTURYMDF®
CENTURYDOORS™

zykron
FIBRE CEMENT BOARDS & PLANKS

STARKE
NEW AGE PANELS

SAINIK
PLYWOOD
HAMESHA TAIYYAR

For any queries, SMS 'PLY' to 54646 or call us on 1800-2000-440 or give a missed call on 080-1000-5555
E-mail: kolkata@centuryply.com | CenturyPlyOfficial | CenturyPlyIndia | YouTube Centuryply1986 | Visit us: www.centuryply.com

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭৩ বর্ষ ৫ সংখ্যা, ২৮ ভাদ্র, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

১৪ সেপ্টেম্বর - ২০২০, যুগাব্দ - ৫১২২,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : রন্তিদেব সেনগুপ্ত

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

অফিস হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৬

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১২ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৫০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2019-2021

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

ওঁ স্বস্তিক প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ◻ ৪

২১ ফেব্রুয়ারি নয়, ২১ সেপ্টেম্বরই হোক ‘আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস’ ◻ অভিমন্যু গুহ ◻ ৫

বাংলা ভাষা প্রসারে অন্যতম ভগীরথ
◻ ড. পঙ্কজ কুমার রায় ◻ ৭

বঙ্গভাষাকে ধ্রুপদী ভাষা হিসাবে গণ্য করবার সপক্ষে কয়েকটি যুক্তি ও তথ্য ◻ শ্রীজিৎ দত্ত ◻ ৯

পশ্চিমবঙ্গ মাতৃভাষা দিবসের পটভূমি
◻ ড. অচিন্ত্য বিশ্বাস ◻ ১৩

দাড়িভিটের ঘটনা দ্বিজাতিতত্ত্বেরই পরিণাম
◻ ড. জিষ্ণু বসু ◻ ১৬

২০ সেপ্টেম্বর— পশ্চিমবঙ্গ মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপন
◻ ড. তরুণ মজুমদার ◻ ১৮

আত্মবিশ্বাসী ভারতের তীব্র প্রতিরোধের সম্মুখীন চীন
◻ সঞ্জয় সোম ◻ ২০

হালাল একটি জিহাদি কৌশলের অর্থনীতি
◻ ড. প্রদোষরঞ্জন ঘোষ ◻ ২২

ভারত কর্তৃক প্রাচীন চীনের সংক্রমণ নিবারণ বনাম আধুনিক চীনের অনাবশ্যক ভারত আক্রমণ ◻ ডা. আর এন দাস ◻ ২৪

বর্তমানের পরিপ্রেক্ষিতে ভবিষ্যৎ ভারতের সম্ভাব্য রূপরেখা
◻ দূরদর্শী ◻ ২৭

কমিউনিস্ট চীনের স্বরূপ ধীরে ধীরে উন্মোচিত হচ্ছে ◻ ২৯

করোনা প্রাদুর্ভাবই জিডিপি পতনের কারণ : আনলক পর্ব শুরুর সঙ্গেই তা তুমুল বেগে ঘুরে দাঁড়াচ্ছে
◻ কৃষ্ণমূর্তি সুব্রমণিয়ন ◻ ৩১

গ্রন্থাগারের মৃত্যু : অতীত ও বর্তমান
◻ কুণাল চট্টোপাধ্যায় ◻ ৩৩

ভারতীয় শিক্ষার স্বরূপ : সংকল্পনা সমূহের স্পষ্টীকরণ
◻ ইন্দুমতী কাটদরে ◻ ৩৫

হিন্দুত্ব ও ভারতবর্ষ ◻ রঞ্জন কুমার মণ্ডল ◻ ৩৮

মোদীজীর মতো সৎ প্রধানমন্ত্রী ভাগ্যের ও গর্বের বিষয়
◻ মণীন্দ্রনাথ সাহা ◻ ৪০

স্মৃতিকণা বিশ্বাসের সাহস আছে বটে! ◻ শিতাংশু গুহ ◻ ৪২

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

রাজেশ-তাপসের বলিদান বিফলে যাইবে না

মাতৃভাষাকে মাতৃদুগ্ধের সহিত তুলনা করিয়াছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। মাতৃদুগ্ধ যেমন একটি শিশুকে বাড়িয়া উঠিতে সাহায্য করে, মাতৃভাষাও তেমনই একটি জাতিকে তার নিজস্ব সংস্কৃতিকে চিনিতে এবং জানিতে সাহায্য করে। যে নিজের মাতৃভাষাটিই সম্যকভাবে জানে না, সে নিজের সংস্কৃতি সম্বন্ধেও চিরকাল অন্ধই থাকিয়া যায়। মাতৃভাষা হইতেছে একটি জাতির অস্মিতা, জাতির পরিচয়। জাতির এই অস্মিতা রক্ষা করিতে গিয়াই দুই বৎসর আগে দাড়িভিটের দুই কিশোর রাজেশ ও তাপস পুলিশের গুলিতে প্রাণ হারাইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গে আমাদের মাতৃভাষার উপর প্রতিদিন আরবের সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদকে চাপাইয়া দিবার চেষ্টা করা হইতেছে, যেইভাবে বাঙ্গালি জাতির অস্মিতার উপর আঘাত হানিবার চেষ্টা চলিতেছে—তারই প্রতিবাদে প্রাণ দিয়াছে দাড়িভিটের ওই দুই কিশোর। বিশ্বের ভাষা আন্দোলনের ইতিহাসে নিঃসন্দেহে রাজেশ ও তাপসের নাম চিরকাল স্বর্ণাক্ষরে লিখা থাকিবে। কোন ঘটনার প্রতিবাদ করিতে গিয়া ওই দুই কিশোরের এমন আত্মবলিদান?

দাড়িভিটের বিদ্যালয়ে বাংলার শিক্ষকের অভাব ছিল। বিদ্যালয়ের ছাত্ররা দীর্ঘদিন হইতেই বাংলার শিক্ষকের দাবি জানাইয়া আসিতেছিল। সরকার বা শিক্ষা দপ্তর সেই আবেদনে কর্ণপাত করে নাই। বাংলার বদলে তাহারা ওই বিদ্যালয়ে উর্দুর শিক্ষক পাঠাইয়াছিল। এরই প্রতিবাদে বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা বিক্ষোভে শামিল হইয়াছিল। ওই বিক্ষোভ দমন করিতে পুলিশ জঘন্য নৃশংসতার পরিচয় দিয়াছিল। পুলিশি নৃশংসতার শিকার হইয়াছিল ওই দুই যুবক। ইসলামিক সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদকে সুকৌশলে এই পশ্চিমবঙ্গে খিড়কি দরজা দিয়া প্রবেশ করাইয়া দিবার যে চক্রান্ত রাজ্য সরকারের সহযোগিতায় চলিতেছে, দাড়িভিটের বিদ্যালয়ে বাংলার বদলে উর্দু শিক্ষক পাঠাইয়া দেওয়া ছিল সেই চক্রান্তেরই অংশ। বাংলা ভাষার মধ্যে উর্দুর আগ্রাসনের চেষ্টা গত কয়েক বৎসর ধরিয়াই এই রাজ্যে চলিতেছে। বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তকে পিতার পরিবর্তে আব্বা, মাতার পরিবর্তে আম্মি, আকাশের পরিবর্তে আসমান ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করিয়া পশ্চিমবঙ্গকে একটি ইসলামিক রাজ্যে রূপ দিবার অপচেষ্টার এইটিই হইতেছে প্রথম ধাপ। এই আগ্রাসনের হাত হইতে মাতৃদুগ্ধসম বাংলা ভাষাটিকে যদি আমরা রক্ষা করিতে না পারি—তাহা হইলে আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যই ক্রমে বিপন্ন হইয়া পড়িবে। পশ্চিমবঙ্গে বাঙ্গালি হিন্দুর অস্তিত্বও ক্রমশ সংকটের মুখে আসিয়া দাঁড়াইবে।

দাড়িভিটের রাজেশ-তাপস বাঙ্গালি হিন্দুর এই অস্তিত্বের লড়াই করিতে গিয়া প্রাণ দিয়াছে। তাহাদের এই লড়াই বিফলে যাইবে না—এই প্রতিজ্ঞা আমাদের করিতে হইবে। প্রতি বৎসর দাড়িভিটের ওই ভাষা আন্দোলনকে সম্মান জানাইতে 'পশ্চিমবঙ্গ ভাষা শহিদ দিবস' পালন করিতে হইবে।

সুভাষিতম্

প্রবিচার্যোত্তরং দেয়ং সহসা ন বদেৎ ক্বচিৎ।

শত্রোরপি গুণা গ্রাহ্যা দোষাস্ত্যাজ্যা গুরোরপি।।

সর্বদা ভেবেচিন্তে উত্তর দেওয়া উচিত। হঠাৎ করে কিছু বলা উচিত নয়। শত্রুর যদি গুণ থাকে তবে তা গ্রাহ্য আবার গুরুর যদি দোষ থাকে তবে তা ত্যাজ্য।

২১ ফেব্রুয়ারি নয়, ২১ সেপ্টেম্বরই হোক 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস'

অভিমন্যু গুহ

২০১৮ সালের ২১ সেপ্টেম্বর ইসলামপুরের দাড়িভিটে কী হয়েছিল সেটা সকলেই জানেন। দাড়িভিটের একটি বাংলামাধ্যম স্কুলে উর্দু বিষয়ের দুজন শিক্ষকের নিয়োগকে কেন্দ্র করে স্কুলে অশান্তি হয়। ছাত্র-ছাত্রী ও তাদের অভিভাবকদের সঙ্গত দাবি ছিল স্কুলে যেহেতু উর্দু ভাষা শিক্ষার কোনো সুযোগ নেই, তাই উর্দু শিক্ষক নয়, বাংলা, অঙ্ক, বিজ্ঞান, ইংরেজি এরকম বিষয়ের শিক্ষক নিয়োগ হোক। বলাবাহুল্য, প্রশাসন তাদের দাবিতে কর্ণপাত করেনি, উলটে গুলি চালায়। তাতে রাজেশ সরকার ও তাপস বর্মন নামে দুজন কিশোর- বয়স্ক পড়ুয়া নিহত হন। স্বাভাবিকভাবেই এই দিনটিকে স্মরণে রেখে একুশে সেপ্টেম্বর ভাষা-শহিদ দিবস পালনের সিদ্ধান্ত গত বছর থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে নেওয়া হয়েছে। শুধু দাড়িভিটেই এই ঘটনা প্রভাব ফেলেনি। সারা পশ্চিমবঙ্গের মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে গত বছর এই দিনটিকে 'ভাষা শহিদ দিবস' হিসেবে পালন করেছেন। স্বভাবতই কিছু মানুষের এতে গাত্রদাহ হয়েছে, বিশেষ করে যারা মনে করেন একুশে ফেব্রুয়ারিই হলো আন্তর্জাতিক ভাষা দিবস। ইউনেস্কো আন্তর্জাতিক ভাবে এই দিনটিকে ভাষা দিবসের স্বীকৃতিও দিয়েছে। কিন্তু এখন বুঝতে হবে, কোন ভাষা দিবসের সঙ্গে বাঙ্গালির সত্যিই প্রাণের যোগ রয়েছে। প্রথমেই ইতিহাসের দিকে একটু আলোকপাত করা যাক। বাংলাভাষার জননী হিসেবে সংস্কৃত ভাষা স্বীকৃত। কিন্তু ভারতবর্ষে সুদীর্ঘ মুসলমান শাসনে, বঙ্গদেশে সুলতানি ও নবাবি আমলে রাজভাষা হিসেবে আরবি-ফারসি ভাষারই স্বীকৃত ছিল। মধ্যযুগের যে বাংলা সাহিত্যগুলো রচিত হয়েছে, তাতে সংস্কৃতের প্রভাব অনস্বীকার্য, কিছু আরবি-ফারসি শব্দ তাতে মিশে থাকতে পারে। জেমস লং একে 'ইসলামি বাংলা' বলে চালানোর চেষ্টা করেন। তাঁর বক্তব্যে নিজস্ব ব্যাখ্যার সঙ্গে কিছু তথ্যবিকৃতি রয়েছে, কিন্তু ইসলামি বাংলার তত্ত্বটি প্রথম তিনিই দিয়েছিলেন। হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় যখন 'বঙ্গীয় শব্দকোষ' রচনা করেন, তখন খুব স্পষ্টভাবে এই আরবি-ফারসি শব্দগুলোকে চিহ্নিত করেছিলেন। ১৭৭৮ সালে ইংরেজ আমলে বাংলা ভাষায় যখন বই ছাপানো চালু হলো, তখন শ্রীরামপুরে খ্রিস্টান মিশনারিরা বাংলা ভাষাকে সংস্কৃতের প্রভাব মুক্ত করার অপচেষ্টা করলেন। বিশেষ করে তাঁরা তাদের ধর্ম প্রচারের স্বার্থে এই কাজটিকে সুকৌশলে ব্যবহার করছিলেন। ১৮০০ সালের গোড়ায় তাঁরা যে বাংলাভাষার বইগুলি প্রচার করলেন, সেগুলো রামরাম বসু, তারিণীচরণ মিত্র, রাজীবলোচন রায় প্রমুখ লিখেছিলেন তাতে সংস্কৃত ভাষার চেয়ে কথ্য ও অশ্লীল ভাষাকে অধিক প্রাধান্য দেওয়া হয়েছিল। পরবর্তী সময়ে বাংলাভাষার গতিপথ সঠিকভাবে পরিবর্তন করেছিলেন রাজা রামমোহন রায়। তারপর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের যে পাঠ্যপুস্তকগুলি রচনা করেন, তাতে সংস্কৃতের প্রভাব বিদ্যমান। বঙ্কিমচন্দ্রের হাত ধরে বাংলা সাহিত্যের গতিপথ সংস্কৃত-অনুসারী হয়ে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে রাধানাথ শিকদার, প্যারীচাঁদ মিত্র কথ্য ভাষাতেও লিখতে শুরু করেন, কিন্তু তাতেও সংস্কৃতের প্রভাব ছিল যথেষ্ট। মোটকথা, মধ্যযুগে ইসলামি শাসন প্রভাব বিস্তার করার কারণে সংস্কৃত অনুসরণকারী সাহিত্য যে কিছু বিচ্যুতি দেখা গিয়েছিল, তা ভারতের নবজাগরণের সময় আবার সংস্কৃতকেই অনুসরণ করার চেষ্টা করে।

গোল বাঁধলো খণ্ডিত স্বাধীনতার সময়

এদেশের সংস্কৃতি ভুলিয়ে দিয়ে আরবের সংস্কৃতি চাপিয়ে দিতে। বঙ্গাব্দের প্রচলনকারী হিসেবে শশাঙ্কের পরিবর্তে আকবরের নাম হাস্যকর যুক্তিতে বসিয়ে দেওয়া ইত্যাদি ঘটনায় ইসলামি-দুনিয়ার গোপন অ্যাজেন্ডা এখন ক্রমশ প্রকাশ্য। তাই বাংলা ভাষাকে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠা করার দায়িত্ব আমার-আপনার মতো একজন বাঙ্গালিকেই নিতে হবে। আর সেটা করতে হলে বাংলা ভাষা-সাহিত্যে যে বেনোজল ঢুকছে, এখনই তা রোখা দরকার। নইলে আগেই কিছু ভূখণ্ড বেহাত হয়েছে, এবার সংস্কৃতিও যাবে।

যে সাম্প্রদায়িক দেশটির জন্ম হলো তার সরকারি ভাষা উর্দু করার সময়। প্রসঙ্গক্রমে বলে রাখি, উর্দুর প্রচার-প্রসার কিন্তু দিল্লিতেই, মোটামুটি ১১০০ শতকে, মহম্মদ ঘোরির পৃষ্ঠপোষকতায়। বহিরাগত ঘোরি দিল্লিতে তাঁর শাসনকার্য পরিচালনার জন্য এদেশীয় সংস্কৃত-অনুসারী কথ্য-ভাষাকেই বহাল রাখলেন কিন্তু দিল্লিতে লেখার মাধ্যম হিসেবে দেবনাগরী হরফ চালু ছিল, তিনি সেই হরফগুলো খালি আরবি-ফারসিতে বদলে দিলেন। ঘোরী ধুরন্ধর শাসক, খুব ভালোভাবেই জানতেন ভাষার হরফ পালটে গেলে ভাষাটাই আস্তে আস্তে বদলে যাবে, তাতে আরবি-ফারসি শব্দ এমনভাবে মিশবে যে আসল ভাষাটাই চেনা যাবে না। ঠিক তাই ঘটলো, পরে সেই সংস্কৃত-অনুসারী কথ্য ভাষা তার আরবি-ফারসি হরফগুলির দৌলতে পালটাতে পালটাতে আস্তে আস্তে উর্দু ভাষাতে পরিণত হয়। এখন নবগঠিত মুসলমান দেশটির সরকারি ভাষা কী হবে, সেটা নিয়েই হলো গণ্ডগোলের সূত্রপাত। উর্দুকে সরকারি ভাষা হিসেবে মেনে নেওয়া হলেও পূর্ব-পাকিস্তানের জনগোষ্ঠী সেই লং-কথিত ইসলামি-বাংলাকেই সরকারি ভাষা করতে চাইছিল। লঙ তবু বাংলা ভাষার এই খারাপ পরিণতি দেখেননি। পূর্ব-পাকিস্তানের জনগোষ্ঠী যা করতে চলেছিল, আজ স্বাধীন ইসলামি বাংলাদেশে তার স্বরূপ দেখা যাচ্ছে, আরবি-ফারসি শব্দে পরিপূর্ণ একটা ভাষাকে বাংলা ভাষার রূপ দেওয়া হয়েছে, এগুলো আগে বহু আলোচিত, নতুন করে কিছু বলার নেই। শুধু বলার এই ‘ইসলামি বাংলা’র সঙ্গে উর্দুর বিশেষ তফাত নেই, দুটিই আরবি-ফারসি অনুসারী, তফাত শুধু হরফে, একটি আরবি-ফারসিতে, অপরটিও আরবি-ফারসি প্রভাবযুক্ত বাংলায়। তাই ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় যে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে আন্দোলনে পাঁচজনের মতো শহিদ হন, যার ফলে দিনটিকে ইউনেস্কো ১৯৯৯ সালে ‘আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে’র সম্মান দিয়েছে, তার সঙ্গে আপামর বাঙ্গালির কোনও যোগ নেই। এই কথাটি আমাদের বুঝতে হবে, এটা হলো নবগঠিত একটি ইসলামিক দেশের অভ্যন্তরীণ ক্ষমতা কায়েমের অঞ্চলগত গণ্ডগোল, শুধু বাঙ্গালি সেন্টিমেন্টকে ব্যবহার করা হয়েছে। ব্যবহার করার কারণও তো স্পষ্ট। ১৯৪৭-এ ‘যুক্তবঙ্গ’ নামে হতে না পারা আরেকটি স্বাধীন ইসলামি দেশ, যার মধ্যে আজকের পশ্চিমবঙ্গও থাকতো, সেই আক্ষেপ যাবে কোথায়?

তাই আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের নামে আদৌ যা পালিত হয়, তাতে হিন্দু বাঙ্গালির, সামগ্রিকভাবে বাংলা ভাষারও কোনও সম্বন্ধ নেই।

এটা একটা আন্তর্জাতিক চক্র। যারা বেশ কয়েকবছর যাবৎ সক্রিয় হয়েছে, এদেশের সংস্কৃতি ভুলিয়ে দিয়ে আরবের সংস্কৃতি চাপিয়ে দিতে। বঙ্গাব্দের প্রচলনকারী হিসেবে শশাঙ্কের পরিবর্তে আকবরের নাম হাস্যকর যুক্তিতে বসিয়ে দেওয়া ইত্যাদি ঘটনায় ইসলামি-দুনিয়ার গোপন অ্যাজেন্ডা এখন ক্রমশ প্রকাশ্য।

তাই বাংলা ভাষাকে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠা করার দায়িত্ব আমার-আপনার মতো একজন বাঙ্গালিকেই নিতে হবে। আর সেটা করতে হলে বাংলা ভাষা-সাহিত্যে যে বেনোজল ঢুকছে, এখনই তা রোখা দরকার। নইলে আগেই কিছু ভূখণ্ড বেহাত হয়েছে, এবার সংস্কৃতিও যাবে। এবং ঐতিহ্যহীন, সংস্কৃতিহীন জাতি মেরুদণ্ড হারানো মানুষের মতোই বেঁচে থাকে। ∎

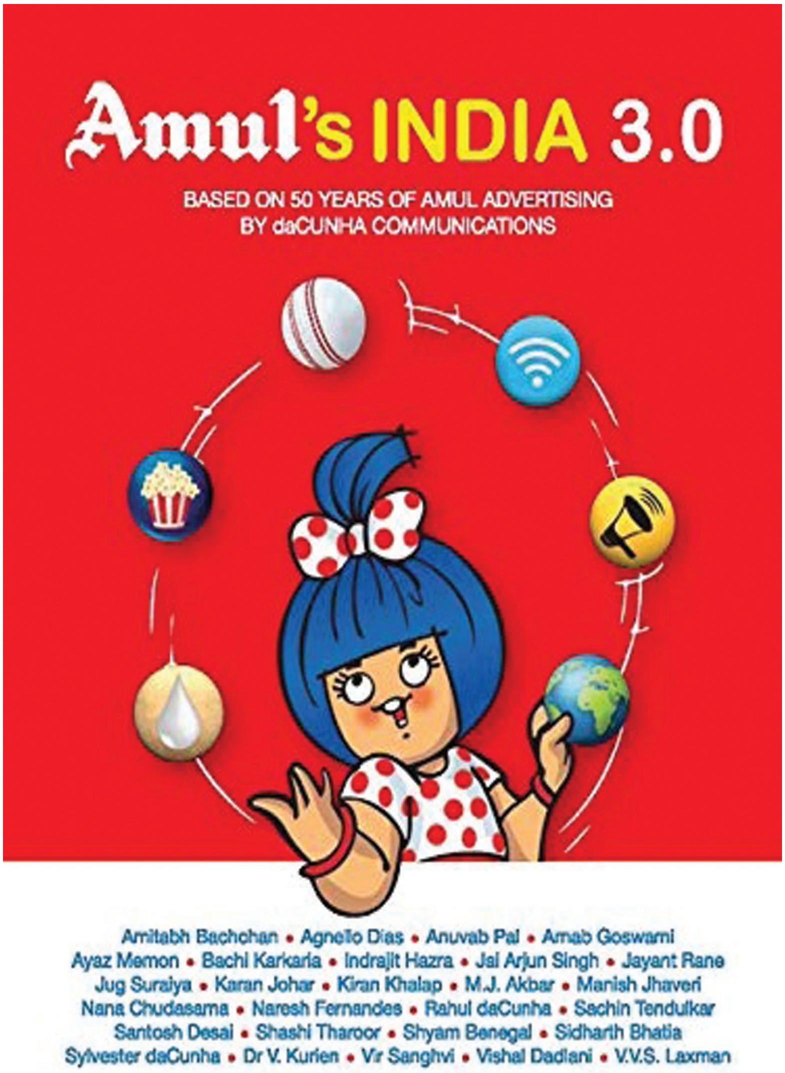

বাংলা ভাষা প্রসারে অন্যতম ভগীরথ

ড. পঙ্কজ কুমার রায়

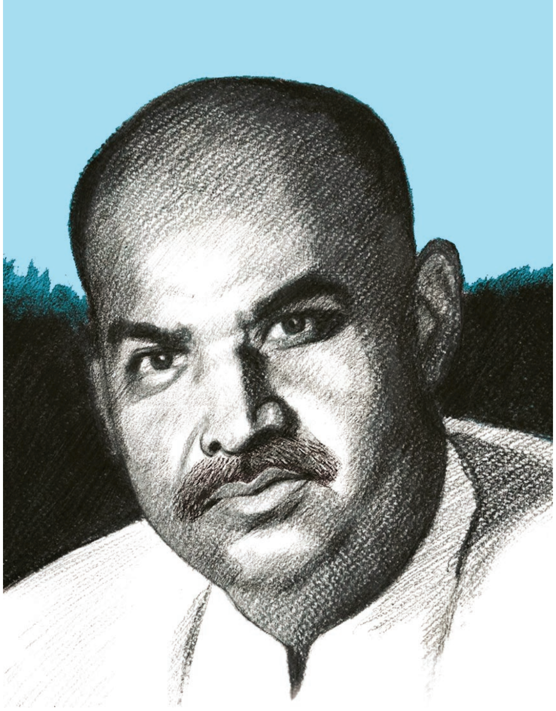

ছাত্রাবস্থায় শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় পিতা স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের ইচ্ছায় স্নাতকস্তরে ইংরেজি বিভাগে প্রথম বিভাগে প্রথম হওয়া সত্ত্বেও বাংলা সাহিত্যে স্নানকোত্তরে ভর্তি হন এবং বাংলার স্নাতকোত্তর বিভাগেও প্রথম বিভাগে প্রথম হন। ছাত্রাবস্থায় শ্যামাপ্রসাদ দাদা রমাপ্রসাদের সঙ্গে বঙ্গবাণী পত্রিকা প্রকাশ করতেন। বঙ্গবাণী পত্রিকায় শরৎচন্দ্র চট্টপাধ্যায়ের অভাগীর স্বর্গ ও মহেশ প্রকাশিত হয়। ১৯২২ সালে বঙ্গবাণী পত্রিকার ২২টি সংখ্যায় পথের দাবি প্রকাশিত হয়। শ্যামাপ্রসাদের কর্মজীবনে ২৮ বছরের মধ্যে প্রথম ১৪ বছর (১৯২৪-১৯৩৮) সারস্বত সাধনায় অতিবাহিত হয়। শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির জন্মশতবর্ষে দেশ পত্রিকায় লেখা হয়, 'শিক্ষা ও রাজনীতির ক্ষেত্রে তাঁর অবদান খুব হেলাফেলার নয়' (দেশ, সম্পাদকীয়, ৪ জুলাই ২০০১ পৃষ্ঠা ৫)। ১৯৩২ সালের ৪ জুলাই তাঁরই উদ্যোগে বাংলা ভাষার প্রসার ও উন্নতিকল্পে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে স্নাতকোত্তর ও গবেষণায় সুবিধার জন্য বাৎসরিক ৫০০০ টাকা সাম্মানিকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর সঙ্গে যুক্ত করা হয়। সেই ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তের প্রতিলিপি এরূপ :

"2. That Dr. Rabindranath Tagore be invited to accept an engagement with the University for two years with effect from the 1st August, 1932, on the following terms :

(i) That he is to deliver a course of lectures each year on selected topics connected with Bengali language and literature for the benefit and guidance of post-graduate students and is to co-operation with the University in promoting and resarch in Bengali into University.

(ii) That his honorarium be Rs. 5,000 per year to be paid out of Ramtanu Lahari Fund.

(iii) That he be given the status of University Professor, but the ordinary rules relating to leave, residence etc. of the University Professor will not apply to him." (Collected from University of Calcutta, Rabindranath Tagore Gallery)

সেনেট বৈঠক থেকে ফিরে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি শান্তিনিকেতন থেকে পাঠানো রবীন্দ্রনাথের চিঠি পান।

শ্রী শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, শান্তিনিকেতন

কল্যাণেয়েষু,

বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রেণীতে আমাকে নিযুক্ত করা হয়েছে বলে দেশে একটা অসন্তোষ সৃষ্টি করা হলো। সাধারণের মধ্যে কথা উঠেছে এটা আমার পক্ষে অসঙ্গত ও অসম্মানকর....

আমার শরীর এখন ক্লান্ত বন্ধুর পথে নিরন্তর আঘাত সহ্য করে চলার শক্তি আমার নেই— এই কারণে শঙ্কিত হয়েছি। কী করা কর্তব্য যথার্থ বন্ধুভাবে সেকথা চিন্তা করে পরামর্শ দিও। দেশের কাছে আমার জীবনের যদি কোনোই মূল্য থাকে তবে যাতে আমার মানহানি ও শান্তি নষ্ট না হয় সেকথা চিন্তা করা তোমাদেরই কর্তব্যই হবে।

ইতি—

তোমাদের

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২১ জুলাই ১৯৩২

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই চিঠি পাওয়ার পর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রত্যুত্তোর দিতে কালবিলম্ব করেননি।

৭৭ আশুতোষ মুখার্জি রোড
কলকাতা
২৪ জুলাই ১৯৩২

শ্রীচরণকমলেষু,

যে কাজের জন্য আপনার সাহায্য প্রার্থনা করেছি, সে কাজ যথার্থই দেশের মঙ্গলকারক, বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট হতে এইরূপ সংস্কারের দাবি আপনি বহুকাল ধরে করে এসেছেন। আজ যখন বিশ্ববিদ্যালয় আপনাকে এই বৃহৎ কাজে যোগ দেবার জন্য অনুরোধ করেছে, আপনি দ্বিধাশূন্য মনে এই আহ্বান গ্রহণ করুন এই আমার প্রার্থনা।

ইতি—
প্রণতঃ
শ্রী শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।

(এই পত্রদুটি শতবর্ষের আলোয় শ্যামাপ্রসাদ শারদ সংকলনে দীনেশচন্দ্র সিংহের লেখা 'ড. শ্যামাপ্রসাদ ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়', প্রকাশক ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি স্মারকসমিতি, ২০০১, পৃষ্ঠা-৪১-৪২)

শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ১৯৩৪ সালে ৮ আগস্ট মাত্র ৩৩ বছর বয়সে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে যোগদান করেন। উপাচার্য থাকাকালীন বাংলা ভাষা প্রচার ও প্রসারের জন্য কতগুলি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেন তার মধ্যে অন্যতম হলো মাতৃভাষার মাধ্যমে ম্যাট্রিকুলেশন স্তরে পঠনপাঠন ও পরীক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা। অন্যদিকে বাংলা ভাষায় গবেষণা পত্র দাখিলের অনুমতি প্রদান। শ্যামাপ্রসাদের বাংলা বানানের নিয়ম কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত হয়। বাংলা বানানের নিয়ম দ্বিতীয় সংস্করণ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শরৎচন্দ্র চট্টপাধ্যায় কর্তৃক সমর্থিত হয়। ১৯৩৬ সালের ১১ সেপ্টেম্বর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বানান বিধির সমর্থনে লিখেছিলেন, ''বাংলা বানান সম্বন্ধে যে নিয়ম বিশ্ববিদ্যালয়ে নির্দিষ্ট করিয়া দিলেন আমি তাহা পালন করিতে সম্মত আছি।'' শুধু তাই নয় রাজশেখর বসুর বৈজ্ঞানিক শব্দের বাংলা পরিভাষা রচনা ও সংকলনের পেছনে যে মানুষটির নিরন্তর উৎসাহ ছিল তিনি আর কেউ নন ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি। রাজশেখর বসুর বাংলা অভিধান তার বাহ্যিক প্রকাশ। ইংরেজ আমলে ১৯৩৭ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি বাংলা ভাষায় প্রথম দীক্ষান্ত ভাষণ দিতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, ''...বিশ্ববিদ্যালয়ের দীক্ষা মন্ত্র থেকে বঞ্চিত আমার মতো ব্রাত্য বাংলা লেখককে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি দিয়ে আশুতোষ প্রথম রীতি লঙ্ঘন করেছেন, তাঁরই পুত্র (শ্যামাপ্রসাদ) সেই ব্রাত্যকেই আজকের দিনের অনুষ্ঠানে বাংলা ভাষায় অভিভাষণ পাঠ করতে নিমন্ত্রণ করে পুনশ্চ সেই রীতিরই দুটো গ্রন্থি একসঙ্গে যুক্ত করেছেন। এতে বোঝা গেল বাংলাদেশে শিক্ষাজগতে ঋতু পরিবর্তন হয়েছে, পাশ্চাত্য আবহাওয়ার শীতে আড়ষ্ট শাখায় আজ এল নবপল্লবের উৎসব।'' (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দীক্ষান্ত ভাষণের অংশবিশেষ ১৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৭)

(লেখক অধ্যক্ষ যোগেশ চন্দ্র চৌধুরী কলেজ, কলকাতা)

বঙ্গভাষাকে ধ্রুপদী ভাষা হিসেবে গণ্য করবার সপক্ষে কয়েকটি যুক্তি ও তথ্য

আধুনিক ভারত রাষ্ট্রের জাতীয় সংগীত 'জনগণমন অধিনায়ক' যেমন বঙ্গভাষায় রচিত, তেমনই আবার এদেশের জাতীয় স্তোত্র 'বন্দে মাতরম্'-এর অর্ধাংশও বঙ্গভাষাতেই রচিত। উভয় রচনাতেই বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের সহস্রাধিক বৎসরব্যাপী অবিচ্ছিন্ন সাহিত্য-পরম্পরাগত সাধনার ঐশ্বর্য ও মাধুর্য পুরোপুরিভাবে বর্তমান।

শ্রীজিৎ দত্ত

সদ্যপ্রকাশিত 'জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০' এদেশের বিদ্যালয় স্তরের ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে সংস্কৃত-সহ অন্যান্য সরকারিভাবে স্বীকৃত ধ্রুপদী ভাষা শিক্ষা করবার এবং সেইসব ভাষায় রচিত গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্যকীর্তিগুলি সরাসরি মূল রূপে পাঠ করবার একটি সুবর্ণ সুযোগ এনে দিয়েছে। এই হিসেবে 'জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০'-র এই বিশেষ অনুবিধিগুলি (৪.১৭-৪.১৯) দেশীয় ভাষায় শিক্ষালাভের যে নতুন পথ তৈরি করে দিয়েছে, তা বিজাতীয় ভাষার জাঁতাকলে আটকে পড়া ভারতীয় মননের মুক্তিলাভের পক্ষে প্রশস্ত ও নিঃসন্দেহে সাধুবাদযোগ্য। তবে এই প্রসঙ্গে সরকারিভাবে স্বীকৃত ছয়টি ভারতীয় ধ্রুপদী ভাষা ও সেগুলির সমমর্যাদাপ্রাপ্ত আরও তিনটি ভাষার যে তালিকা জাতীয় শিক্ষানীতির উল্লিখিত অনুবিধিগুলিতে প্রকাশিত হয়েছে, সেই তালিকায় বঙ্গভাষার অনুপস্থিতি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে মহাবিদ্রোহকে নির্মমভাবে দমন করবার পর ব্রিটিশরাজ সরকারিভাবে এদেশের সিংহাসনে জাঁকিয়ে বসবার সমসময়েই ভারতীয় মননের দাসত্বশৃঙ্খল মোচনের আকাঙ্ক্ষাটি মূলত যে ভারতীয় ভাষায় সহস্রদল কমলের মতো বিকশিত হয়ে ফুটেছিল সে ভাষাটি হচ্ছে বঙ্গভাষা এবং ওই সময়ে ভারতবর্ষের যে প্রদেশে ভারতমাতার সন্ততিদের আধ্যাত্মিক, শারীরিক, মানসিক পরাধীনতা মোচনের শুভ কর্মযজ্ঞটির সূচনা হয়েছিল সে প্রদেশ হচ্ছে বঙ্গদেশ। কাজেই এ যুগের কথা মাথায় রেখে নির্মিত কোনো জাতীয় শিক্ষানীতি ভারতের নতুন প্রজন্মের ছাত্র-ছাত্রীদেরকে বঙ্গভাষা, বঙ্গীয় সাহিত্য সংস্কৃতি ও ইতিহাসের সঙ্গে সরাসরি পরিচিত হবার সুযোগ করে দিতে ব্যর্থ হলে এ-যুগীয় ভারতীয় মননের আধুনিক (এবং সেইসূত্রে জটিলতর হয়ে ওঠা) পরমুখাপেক্ষী অধীনতাগুলি ঘোচাবার চেষ্টাটি কতদূর সফল হবে, সেই বিষয়ে বিস্তর সন্দেহের অবকাশ রয়ে যায়।

বঙ্গভাষায় বহুবিধ কথিত ও লিখিত মাধ্যমে লভ্য উপাদানগুলির দৃঢ়ভিত্তির উপরে দাঁড়িয়েই আধুনিক ভারতবর্ষের জাতীয়তাবোধ তথা এদেশের রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্মনীতির রূপরেখা নির্মিত হয়েছে। শিক্ষাক্রম ও গবেষণার দৈন্যের কারণে আজকের দিনে দাঁড়িয়ে এই দাবিটি কারো কারো কাছে অতিশয়োক্তি বলে মনে হতে পারে, তথাপি এটা সত্য। এই দাবির সপক্ষে তথ্যপ্রমাণ যথেষ্টই মজুত রয়েছে। উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে— বঙ্কিমচন্দ্র, দীনবন্ধু মিত্র, মধুসূদন দত্ত, রমেশচন্দ্র দত্ত, চন্দ্রনাথ বসু, বিবেকানন্দ, সত্যেন্দ্রনাথ-জ্যোতিরিন্দ্রনাথ-রবীন্দ্রনাথ, শ্রীঅরবিন্দ প্রমুখ বঙ্গীয় তিত্তাবিদ-সাহিত্যিকদের সাহিত্যকীর্তিতে সমৃদ্ধ জাতীয়তাবাদী রচনাসম্ভারের। উদাহরণ টানা যেতে পারে হিন্দুমেলা, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, অনুশীলন সমিতি, যুগান্তর, বন্দে মাতরম্ গোষ্ঠীগুলির। নাম করা যেতে পারে গিরীশচন্দ্র ঘোষ, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, রজনীকান্ত সেন, অতুলপ্রসাদ সেন, মুকুন্দ দাস, কাজী নজরুল ইসলাম, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতো অভিনেতা, নাট্যকার, গীতিকার, চারণকবি ছবি আঁকিয়েদের, যাঁরা নিজ নিজ কলা-শিল্পসৌকর্য, কল্পনা-অনুভব তথা অবাধ সৃষ্টিশীলতার নৈবেদ্য সাজিয়ে ভারতমাতার ধারণা, তাঁর পরাধীনতার দুঃখ-অপমান এবং তাঁর মুক্তির মন্দিরটিকে আপামর বঙ্গবাসী তথা ভারতবাসীর ধরাছোঁয়ার মধ্যে এনে দিয়েছিলেন। এই সৃষ্টি ও চিন্তার ভাণ্ডারটির প্রায় সবটাই তাঁরা পরিপূর্ণ করেছেন বঙ্গভাষায় রচিত সাহিত্যকর্ম, সংগীতমালা, নাটক, প্রহসন, বক্তৃতামালা, চিঠিপত্র দিয়ে। এঁদের পরবর্তী

প্রজন্মের মধ্যে যাঁরা অগ্রগণ্য, যেমন, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর বইপত্রের মধ্যে তরুণের স্বপ্ন, জরুরি কিছু লেখা এই রচনাগুলি বঙ্গভাষাতেই নিবদ্ধ। এহেন বিপুল লিখিত-অলিখিত, প্রকাশিত-অপ্রকাশিত জাতীয়তাবাদী বঙ্গীয় সাহিত্যসম্ভারের অতি যৎসামান্য অবশ্যই অধুনা অনুবাদের মাধ্যমে লভ্য। যেটুকু বা লভ্য তা হলো আধুনিকালে (অর্থাৎ উনবিংশ শতকের মাঝামাঝি সময় ও তৎপরবর্তীকালে) বঙ্গভাষায় রচিত ভারতীয় জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারার এবং আরও বৃহৎ পরিসরে দাঁড়িয়ে দেখলে সমগ্র ভারতবর্ষীয় সভ্যতার চিন্তা ও সৃজনের আধাররূপী হিমশৈলটির চূড়ার অগ্রভাগ মাত্র। এই সেদিন দক্ষিণ ও উত্তর ভারতের ছাত্র-ছাত্রী ও সহকর্মীদের প্রশ্নের উত্তরে নিজের বক্তব্য রাখবার সময় ভারতবর্ষীয় সমাজ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের 'স্বদেশী সমাজ' ও 'ব্রাহ্মণ' শীর্ষক প্রবন্ধগুলি থেকে উদ্ধৃতি টেনে বোঝাতে গিয়ে জানতে পেলাম যে, এই রচনাগুলির কোনো ইংরেজি কিংবা হিন্দি অনুবাদ নেই। কিছুদিন হলো রবীন্দ্রনাথেরই 'শিবাজী উৎসব' কবিতার হিন্দি অনুবাদ চেয়ে তদ্বির করছেন পশ্চিম ভারতের একটি পত্রিকার সম্পাদক। বঙ্কিমচন্দ্র- মধুসূদনদের কথা না হয় বাদই দিলাম, বঙ্গভাষা সম্পর্কে অন্ততঃপক্ষে রবীন্দ্রনাথকে মূলে পড়বার মতো চলনসই জ্ঞান না থাকলে স্রেফ অনুবাদের ভরসায় থাকা এদেশের অবঙ্গভাষী শিক্ষার্থী-গবেষকরা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবেন? নব্য-ঔপনিবেশিক শক্তি ও বিজাতীয় একেশ্বরবাদী চিন্তাধারার যে দ্বিমুখী আগ্রাসনের সম্মুখে আজ ভারতবর্ষীয় সভ্যতা এসে দাঁড়িয়েছে, সেই দুস্তর সংগ্রামের কুরুক্ষেত্র কেবলমাত্র অনুবাদের কৃত্রিম টাট্টু ঘোড়ায় চেপে পার হওয়া যাবে কি? নাকি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অনাস্থাভাজন, ভারতবিদ্বেষী, আধুনিক-উত্তরাধুনিক 'গবেষক'দের ব্যাখ্যা অথবা পরের মুখে ঝাল খাওয়ার উপরে নির্ভর করে থাকাটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে?

যাবে না এবং হবে না। কারণ এক্ষেত্রে ভাষা তথা সাহিত্য- সম্পর্কিত জ্ঞানার্জনের

সারণি

ভাষা	আদি লেখ/ফলক/পুঁথি/ গ্রন্থের প্রাচীনত্ব ও ভাষাসাহিত্যের ইতিহাস বিষয়ে প্রামাণ্য গবেষণাগ্রন্থ	ঐতিহ্য হিসেবে পরিগণিত প্রাচীন সাহিত্য	সাহিত্য-পরম্পরার মৌলিকত্ব	আদি/ক্লাসিকাল রূপ ও আধুনিক রূপের মধ্যে ধারাবাহিকতা আছে কি নেই
তামিল	২০০০ বছর	আছে	আছে	আছে
সংস্কৃত	২০০০ বছরের অধিক	আছে	আছে	আছে
কন্নড়	২০০০ বছর	আছে	তেলুগুর মিশেল লক্ষ্যণীয়	ক্ষীণ
তেলুগু	১০০০-১৫০০ বছর	আছে	আছে	আছে
মালয়ালম	৮০০-১০০০ বছর	আছে	তামিল ও সংস্কৃতের মিশেল লক্ষ্যণীয়	
ওড়িয়া	৮০০-১০০০ বছর	চর্যাপদ ও জয়দেবের উপর ভিত্তিহীন একচ্ছত্র দাবি	অন্যান্য পূর্ব ভারতীয় ভাষার মিশেল লক্ষ্যণীয়	অবিচ্ছিন্ন ধারাবাহিকতা নেই
পালি	২০০০ বছরের অধিক	আছে	আছে	প্রযোজ্য নয়
প্রাকৃত	১৫০০ বছরের অধিক	আছে	অবিমিশ্র নয়	প্রযোজ্য নয়
ফার্সি ভাষা	১৫০০ বছর, বিজাতীয় ভাষা	আছে, বিজাতীয় ভাষা	অবিমিশ্র নয়, বিজাতীয় ভাষা	নেই, বিজাতীয়
বঙ্গভাষা	অন্তত ১৩০০ বছর	চর্যাপদ	আছে	আছে

উপাদানগুলির সুবিশাল চাহিদা ও আশু প্রয়োজনীয়তার তুলনায় জোগানের পরিমাণ নিতান্তই তুচ্ছ। সুতরাং বর্তমানে সারাদেশের নবীন প্রজন্মের শিক্ষার্থী ও গবেষকদের সুবিধে তথা আধুনিককালে ভারতবর্ষীয় জাতীয়তাবোধ ও সভ্যতার রূপরেখা নির্মাণের সর্ববৃহৎ ও মৌলিক মাধ্যমটির সঙ্গে তাঁদের অন্তরঙ্গ পরিচয় ঘটাবার খাতিরে (এবং যোগ করা দরকার, বঙ্গভাষাভাষী ভারতীয় ও তাঁদের সংস্কৃতি, ইতিহাস, জীবনযাপন সম্পর্কে নানাবিধ ভুল ধারণার অবসান ঘটাবার খাতিরেও) বঙ্গভাষার দ্রুত প্রসার ও প্রচার একান্তভাবে বাঞ্ছনীয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আরও লক্ষণীয়, মানবসম্পদ ও উন্নয়নমন্ত্রক ভারতের স্বীকৃত ধ্রুপদী ভাষাগুলির প্রচারের জন্য সেই ভাষাগুলিকে নির্দিষ্ট কিছু সুযোগ-সুবিধা দেবার কথা ঘোষণা করেছে। এগুলি হলো :

১. ধ্রুপদী/ক্লাসিকাল ভারতীয় ভাষার বিশিষ্ট পণ্ডিতদের দুটি বড়োমাপের আন্তর্জাতিক বার্ষিক পুরস্কার দেওয়া হবে।

২. ধ্রুপদী ভাষাগুলির পঠনপাঠন ও সে বিষয়ে গবেষণার জন্য 'সেন্টার অব এক্সেলেন্স' স্থাপন করা হবে (সংস্কৃত ও তামিলের জন্য ইতিমধ্যেই তা করা হয়ে গিয়েছে)।

৩. বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন ভারতের কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে স্বীকৃত ভারতীয় ধ্রুপদী ভাষাগুলির জন্য বেশ কয়েকটি সম্মাননীয় 'চেয়ার' বা পদ চালু করার লক্ষ্যে কাজ করছে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে তাই আমাদের প্রশ্ন হলো : বঙ্গভাষাকে ধ্রুপদী/ ক্লাসিকাল ভাষা হিসেবে গণ্য করা হবে না কেন? একইসঙ্গে বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিষয়ের পড়ুয়া, গবেষক, তথা সারা ভারতের ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে পড়াশুনো, গবেষণা করতে আগ্রহী ছাত্র-ছাত্রীরা একেবারে বিদ্যালয় স্তর থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয় স্তর অবধি বঙ্গভাষা ও সাহিত্য পাঠ করবার সুযোগ এবং মানবসম্পদ ও উন্নয়নমন্ত্রকের উপরোক্ত

সুযোগ-সুবিধাগুলি থেকেই বা বঞ্চিত হবে কেন?

এখন প্রশ্ন হলো, আজকের সময়ে দাঁড়িয়ে বঙ্গভাষা ও বঙ্গসাহিত্যের প্রসার-প্রচার কীরূপে সম্ভব হবে? এই প্রশ্নের একটি সহজ উত্তর হলো--- ভাগ্যক্রমে হাতের কাছে এসে উপস্থিত হওয়া 'জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০'-র দেশীয় ভাষাশিক্ষা সংক্রান্ত সুপারিশগুলিকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা এবং যেহেতু এই সুপারিশগুলির মধ্যে অন্যতম কয়েকটির মূল বক্তব্য হলো ভারতে সরকারিভাবে স্বীকৃত ধ্রুপদী ভাষাগুলিকে গভীরভাবে জানবার সুযোগ বিদ্যালয়স্তরের শিক্ষার্থীদের নাগালের মধ্যে এনে দিতে হবে, সেই হেতু শীঘ্রাতিশীঘ্র বঙ্গভাষাকে ভারতের অন্যতম একটি ধ্রুপদী ভাষা হিসেবে পরিগণিত করবার ব্যবস্থা করা। এবং এই ব্যবস্থা করবার চেষ্টাটি গায়ের জোরে সম্পন্ন করবারও দরকার পড়বে না, কারণ বঙ্গভাষাকে ভারতের ধ্রুপদী ভাষা হিসেবে গণ্য করবার সরকারি স্বীকৃতি আদায়ের জন্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় জোরালো যুক্তি ও তথ্য পূর্ব পূর্ব ভাষাতত্ত্ববিদ, গবেষক ও পণ্ডিতদের পরিশ্রমের ফসল হিসেবে আমাদের হাতের কাছেই রয়েছে। সেইসব গবেষণালব্ধ তথ্য ও যুক্তিগুলিকে একত্র করে ভারত সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রকের সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের কাছে তুলে ধরতে পারলেই জাতীয়তাবাদী বঙ্গভাষাভাষী ও স্বাজাত্যপ্রেমী নাগরিক হিসেবে আমাদের কর্তব্য পালন করা হবে। নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদগুলিতে এইসব যুক্তি ও তথ্যের সারাৎসার সংক্ষেপে তুলে ধরবার চেষ্টা করা হলো।

এযাবৎ সরকারি স্বীকৃতি প্রাপ্ত ভারতীয় ধ্রুপদী ভাষাগুলির তালিকা (সরকারি স্বীকৃতি প্রাপ্তির বছর-সহ) নিম্নরূপ :

- তামিল— সেপ্টেম্বর, ২০০৪
- সংস্কৃত— ২০০৫
- কন্নড়— ২০০৮
- তেলুগু— ২০০৮
- মালয়ালম— ২০১৩
- ওড়িয়া— ফেব্রুয়ারি, ২০১৪

উল্লেখ্য, এই ছ'টি ভাষাই ২০০৪ থেকে ২০১৪-র মধ্যে অর্থাৎ ইউপিএ সরকারের কার্যকালে ধ্রুপদী/ক্লাসিকাল ভাষা হিসেবে সরকারি স্বীকৃতি পেয়েছে। জাতীয় শিক্ষানীতি, ২০২০-র ৪.১৭-৪.১৯নং অনুবিধিগুলি অনুযায়ী এই ছ'টি ভাষার সঙ্গে পালি, প্রাকৃত ও ফার্সি (বিদেশিভাষা), এই তিনটি ভাষাকে ও ভারতীয় ধ্রুপদী ভাষার সম মর্যাদা দেওয়া হয়েছে।

বিগত ইউপিএ সরকারের কেন্দ্রীয় সংস্কৃতিমন্ত্রক দ্বারা (সেসময় কেন্দ্রের মন্ত্রী ছিলেন রাজস্থানের কংগ্রেস নেত্রী মহারানি চন্দ্রেশ কুমারী কটোচ) ২০১৪-র ফেব্রুয়ারি মাসে রাজ্যসভায় প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী জানা যাচ্ছে যে একটি ভাষাকে ধ্রুপদী ভাষা হিসেবে ঘোষণা করবার লক্ষণগুলি হলো :

১. **ভাষাটির প্রাচীনত্ব :** ওই ভাষার আদি গ্রন্থ/পুঁথি হিসেবে বিবেচিত হয় এমন পাঠগুলি কতখানি প্রাচীন, অথবা ওই ভাষার ইতিবৃত্ত সংক্রান্ত ১৫০০ থেকে ২০২০ বছরের পুরনো ইতিহাস নথিবদ্ধ রয়েছে কিনা।

২. ওই ভাষায় রচিত কোনো প্রাচীন সাহিত্য অথবা প্রাচীন গ্রন্থ রয়েছে কিনা, যে সাহিত্য অথবা গ্রন্থরাজিকে ওই ভাষাভাষী মানুষজন প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে নিজেদের মূল্যবান ঐতিহ্য হিসেবে গণ্য করে আসছে।

৩. ওই ভাষায় রচিত সাহিত্য-পরম্পরা মৌলিক নাকি অন্য কোনো ভাষাভাষী সম্প্রদায়ের সাহিত্য-পরম্পরা থেকে ধার করা। এবং

৪. ওই ভাষার ক্লাসিকাল রূপ ও তাতে রচিত সাহিত্যকর্ম ভাষাটির আধুনিক রূপ তথা আধুনিক সাহিত্যের তুলনায় পৃথক হতে পারে, এই ক্লাসিকাল রূপ এবং তার পরবর্তী রূপগুলি অথবা ক্লাসিকাল রূপটি থেকে অদ্ভুত আধুনিক ভাষারূপটির মধ্যে ধারাবাহিকতার অভাবও থাকা সম্ভব।

- উপরোক্ত সবকটি লক্ষণই বঙ্গভাষাতেও বিদ্যমান—

১. ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও ড. সুকুমার সেন উভয় বিশেষজ্ঞের মতেই বঙ্গভাষার সূত্রপাত হয় খ্রিস্টীয় দশম শতাব্দীতে, কথ্যভাষা মাগধী প্রাকৃত থেকে লিখিত ভাষা মাগধী অপভ্রংশ হয়ে বঙ্গভাষার পথচলা শুরু। ড. চট্টোপাধ্যায় ও ড. সেনের সমসাময়িক বঙ্গভাষা-বিশেষজ্ঞ মুহম্মদ শহীদুল্লাহয়ের মতে, কথ্য ও লিখিত গৌড় প্রাকৃত তথা গৌড় অপভ্রংশ থেকেই বঙ্গভাষার উৎপত্তি, এই হিসেবে বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের লিখিত ও কথ্য রূপদুটির ইতিহাস অন্তত ১৩০০ বছরের পুরনো।

২. বঙ্গভাষার সাহিত্য ভাণ্ডারে প্রাচীনতম নিদর্শন হলো চর্যাপদ বা চর্যগীতি, যানেপালের রাজদরবার থেকে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী পুনারাবিষ্কার করেন। এই চর্যাপদের ভাষা এবং বর্ণমালা, অর্থ ও রূপগত দিক দিয়ে আধুনিক বঙ্গভাষারই আদিরূপ। বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসের বিশেষজ্ঞদের মতে, বঙ্গভাষার প্রাচীনতম সাহিত্যকর্মের নিদর্শন এই চর্যাপদের বয়স কমপক্ষে তেরোশো বছর। চর্যাপদগুলির মধ্যে কোনো কোনোটি খ্রিস্টীয় সপ্তম অষ্টম দশকে রচিত, কেননা এই পদগুলির রচয়িতা শৈব ও বৌদ্ধ তান্ত্রিক সিদ্ধাচার্যদের মধ্যে যাঁরা অপেক্ষাকৃত প্রাচীনতর (যেমন লুইপাদ) তাঁরা আবির্ভূত হয়েছিলেন সপ্তম ও অষ্টম শতাব্দীতে। (ড. মুহম্মদ শহীদুলালাহ্)।

৩. বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে, প্রাচীন চর্যাপদ থেকে শুরু করে আধুনিক সাহিত্য পর্যন্ত বাঙ্গালির নিজস্ব ভাব, খাদ্যাভ্যাস, ভূগোল, পূজা-পার্বণ ইত্যাদি তাদের মৌলিক চরিত্র ও ভাব নিয়ে বর্তমান, যা বঙ্গভাষার সাহিত্যকে অন্যান্য ভাষাগুলি হতে স্বতন্ত্র একটি মৌলিক ভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। এমনকী চর্চাগীতির পদগুলিতেও 'বঙ্গাল দেশ', 'বঙ্গালী ভইলি', 'পঁউয়া খাল' (অর্থাৎ পদ্মা নদী) প্রভৃতি শব্দবন্ধ এবং বাঙ্গালির চিরন্তন খাদ্যতালিকার উল্লেখ পাওয়া যায়। এর মাধ্যমে চর্যাগীতির উপর পূর্ব ভারতীয় ভাষাগুলির মধ্যে বঙ্গভাষার দাবিটি সবচেয়ে জোরালো হয়ে ফুটে ওঠে।

৪. শুধু যে চর্যাপদেই প্রাচীন বঙ্গভাষার নিদর্শন রয়েছে, তাই নয়, এর বাইরেও বেশ কিছু সংস্কৃত গ্রন্থের গোড়ায় অথবা মধ্যে মধ্যে প্রাচীন বঙ্গভাষায় রচিত পদ, দোঁহা, মঙ্গলাচরণ ও ভণিতা জাতীয় রচনার

নিদের্শন যথেষ্ট রয়েছে। এই নিদর্শনগুলির উদাহরণ দিতে গিয়ে ড. সুকুমার সেন উল্লেখ করেছেন দ্বাদশ শতাব্দীর মহারাষ্ট্রের শাসনকর্তা চালুক্যরাজ সোমেশ্বর ভূলোকমল্লের নির্দেশে বিরচিত 'মানসোল্লাস' বা 'অভিলাষার্থ চিন্তামণি' গ্রন্থের কথা। ড. সেন লিখেছেন যে, এই বিশ্বকোষজাতীয় গ্রন্থটির 'গীতবিনোদ' নামক সংগীত ও ছন্দশাস্ত্র সম্বন্ধীয় অংশে চর্যাপদের সমসাময়িক প্রাচীন বঙ্গভাষায় রচিত একটি রাধাকৃষ্ণবিষয়ক পদ বা গীতি এবং ভগবান বিষ্ণুর দশাবতারস্তোত্রের কিয়দংশ পাওয়া গিয়েছে। ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে এই দশাবতারস্তোত্র শুধুমাত্র পরশুরামকে উৎসর্গীকৃত পদটিই নয়, এমনকী মৎস্যাবতারকে উদ্দেশ্য করে রচিত পদটিও প্রাচীন বঙ্গভাষায় রচিত।

প্রাচীন বঙ্গের মহাকবি জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' কাব্য সংস্কৃত ভাষায় রচিত হয়ে থাকলেও বঙ্গের সাহিত্যপরম্পরায়, বিশেষতঃ বাংলা কাব্যপরম্পরায় বাঙ্গালি জাতির নিজস্ব কাব্য বলেই চিরকাল সমাদৃত হয়ে এসেছে এবং ড. সনের দৃঢ়প্রত্যয়, ভবিষ্যতেও তেমন ভাবেই সমাদৃত হতে থাকবে। গীতিগোবিন্দ কাব্য বঙ্গভাষার প্রাচীন কবি বড়ু চণ্ডীদাস থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনাথ হয়ে একেবারে আধুনিকতম বাংলা ব্যাণ্ডের গানের কথাতেও স্পষ্ট করেই আপন প্রভাব ফেলে গিয়েছে। বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের পরম্পরার ধারাবাহিকতার প্রশ্নে এটি একটি উল্লেখযোগ্য উপাদান।

এবার এক ঝলকে দেখে নেওয়া যাক, বিগত ইউপিএ সরকারের কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি মন্ত্রক কর্তৃক ২০১৪-র ফেব্রুয়ারি মাসে রাজ্যসভায় প্রদত্ত তথ্য হতে প্রাপ্ত কাঠামোটি অনুযায়ী কোনো ভারতীয় ভাষাকে ধ্রুপদী ভাষা হিসেবে ঘোষণা করবার লক্ষণগুলির নিরিখে ইতিমধ্যেই ধ্রুপদী-তকমাপ্রাপ্ত ছ'টি ভাষা, বিশেষ মর্যাদাপ্রাপ্ত তিনটি ভাষা এবং সর্বোপরি বঙ্গভাষা— এই দশটি ভাষার কোনটি কোন অবস্থানে রয়েছে : ***(সারণি দ্রষ্টব্য)***

অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে যে ভারতীয় ধ্রুপদী ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি লাভের জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত সরকারি শর্তই বঙ্গভাষা যথাযথভাবে পূরণ করতে পারছে। চর্যাপদ, বৈষ্ণবপদাবলী, মঙ্গলকাব্য, শ্রীরামপাঁচালী, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, গীতাঞ্জলির মতো অক্ষুণ্ণ পরম্পরাবিশিষ্ট এবং ঐশ্বর্যমণ্ডিত সাহিত্যকর্মে সমৃদ্ধ বঙ্গভাষার ঐতিহ্য প্রশ্নাতীত। উপরন্তু এযাবৎ সরকারি স্বীকৃতিপ্রাপ্ত ছ'টি ভারতীয় ধ্রুপদী ভাষা ও তাদের সমমর্যাদা বিশিষ্ট আরও তিনটি ভাষা, মোট ন'টি ভাষার একটিও এখনো পর্যন্ত নোবেল পুরস্কারের মতো আন্তর্জাতিক ও সর্বমান্য স্বীকৃতি পায়নি, যা একমাত্র ভারতীয় ভাষা হিসেবে বঙ্গভাষার একজন কবি পেয়েছেন। এই ন'টি ভাষা যে সমস্ত যুক্তির ভিত্তিতে ধ্রুপদী ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে, সেই সবকটি যুক্তি দাবি পূর্ণ করা সত্ত্বেও এবং বিশ্বজোড়া বন্দিত-পুরস্কৃত সাহিত্য সম্পদ থাকা সত্ত্বেও বঙ্গভাষাকে ভারতীয় ধ্রুপদী ভাষা হিসেবে গণ্য করা হবে না কেন?

অতি সম্প্রতি লোকসভায় কংগ্রেসের সংসদীয় দলনেতা অধীররঞ্জন চৌধুরী ভারতের প্রধানমন্ত্রী ও পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি লিখে বঙ্গভাষাকে ভারতের অন্যতম একটি ধ্রুপদী/ক্লাসিকাল ভাষা হিসেবে সরকারি স্বীকৃতি দেবার জন্য তদ্বির করেছেন। কিন্তু যে সময়ে ভারতীয় ধ্রুপদী ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে ছ'টি ভাষাকে, সেই সময়কালে অর্থাৎ ২০০৪-এর সেপ্টেম্বর মাস থেকে ২০১৪-র ফেব্রুয়ারি— এই দীর্ঘ সময়কালের পুরোটা জুড়ে কেন্দ্রে দুটি পর্বে কংগ্রেস চালিত ইউপিএ সরকার থাকা সত্ত্বেও (এবং এই সময়কালের মধ্যে খোদ অধীরবাবু কেন্দ্রীয় মন্ত্রী থাকা সত্ত্বেও) এতদিন অধীরবাবুর বঙ্গভাষার কথা কিন্তু মনে পড়েনি। উল্লেখ্য, তাঁর কেন্দ্রীয় মন্ত্রিত্বের মেয়াদের মধ্যেই পশ্চিমবঙ্গের পাশের রাজ্য ওড়িশার ভাষা ধ্রুপদী ভাষা হিসেবে সরকারি স্বীকৃতি লাভ করে। তখনও অধীরবাবুদের টনক নড়েনি। এই মুহূর্তে জাতীয় শিক্ষানীতির প্রশ্নে এই প্রসঙ্গটি তুলে ধরে তিনি ও তাঁর দল বাঙ্গালির আবেগে সুড়সুড়ি দিয়ে প্রাদেশিকতার রাজনীতি করতে চাইছেন।

ভারতের আগেভাগেই বাংলাদেশ যদি বঙ্গভাষাকে ধ্রুপদী ভাষা হিসেবে সরকারি স্বীকৃতি দিয়ে বসে, তবে তা হবে বঙ্গভাষার সম্পূর্ণ আরবীকরণের লক্ষ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এই প্রসঙ্গে সীমান্তবর্তী রাজ্য হিসেবে পশ্চিমবঙ্গের গুরুত্ব অনুধাবন করে এবং প্রাদেশিক বিচ্ছিন্নতাবাদী দুরভিসন্ধিকে পরাহত করে পশ্চিমবঙ্গ বিজেপি তথা কেন্দ্রীয় সরকারের উচিত অবিলম্বে বঙ্গভাষাকে ধ্রুপদী ভারতীয় ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দান করবার জন্য যত্নবান হওয়া। বঙ্গভাষার মধ্যে ভারতবর্ষের সনাতন ধর্মচিন্তা ও জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারার যে অফুরন্ত ভাণ্ডার রয়েছে, তেমনটি আর কোনো ভারতীয় ভাষায় লক্ষ্য করা যায় না। এই ভাষাতেই ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব, স্বামী বিবেকানন্দ, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রাজা রামমোহন রায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীঅরবিন্দ, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু এবং আধুনিককালের শ্রীঅনির্বাণ প্রমুখ অবতার ও ঋষিপ্রতিম ব্যক্তিগণ আপনাপন বাণী বিধৃত করে গিয়েছেন। আধুনিক ভারত রাষ্ট্রের জাতীয় সংগীত 'জনগণমন অধিনায়ক' যেমন বঙ্গভাষায় রচিত, তেমনই আবার এদেশের জাতীয় স্তোত্র 'বন্দে মাতরম্'-এর অর্ধাংশও বঙ্গভাষাতেই রচিত। উভয় রচনাতেই বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের সহস্রাধিক বৎসরব্যাপী অবিচ্ছিন্ন সাহিত্য-পরম্পরাগত সাধনার ঐশ্বর্য ও মাধুর্য পুরোপুরিভাবে বর্তমান।

কাজেই বঙ্গভাষাকে ধ্রুপদী ভাষা হিসেবে সরকারি স্বীকৃতি দেওয়া হলে বঙ্গভাষা তথা সাহিত্যের যে প্রচার ও প্রসার ঘটবে, তাতে বঙ্গভাষা ও বঙ্গসাহিত্য- সংস্কৃতি এবং সামগ্রিকভাবে ভারতীয় সংস্কৃতি— উভয়েই সমান লাভবান হবে।

(লেখক ডিরেক্টর, সিভিলাইজেশনাল স্টাডিজ বিভাগ ও সহকারী অধ্যাপক, রাষ্ট্রম্ স্কুল অব পাবলিক লিডারশিপ)

পশ্চিমবঙ্গ মাতৃভাষা দিবসের পটভূমি

হিন্দু বাঙ্গালি কি বেঁচে আছে? নাকি নদী তীরের শ্মশানই তাদের শেষ ঠিকানা? উত্তর দেবার দায় কিন্তু এই সময়ের পশ্চিমবঙ্গবাসীর।

ড. অচিন্ত্য বিশ্বাস

'পশ্চিমবঙ্গ মাতৃভাষা দিবস' একটি নতুন পরিস্থিতির ফল। ওই ইতিহাসের সূচনা ১৯০৫-এর বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন থেকে— একথা বললে ভুল হবে না। ব্রিটিশ সরকার বঙ্গদেশকে দু'ভাগে ভাগ করার প্রস্তাব দিতে না দিতেই বঙ্গসমাজ তীব্র প্রতিক্রিয়া জানায়। ধর্মনিরপেক্ষতার মোহাঞ্জন চোখে না লাগানো থাকলে বোঝা যাবে এই অন্দোলনে বঙ্গের শিক্ষিত মুসলমানরা সমর্থন করেননি। তাঁদের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে সামান্য দুয়েকটি দৃষ্টান্ত আনছি।

১. 'মাসিক ইসলাম প্রচারক'-এর সপ্তম বর্ষ পঞ্চম সংখ্যায় এখানে মওআ'জ লিখলেন : 'ইংরেজ শাসনাধীনে যে আমরা পরম সুখ শান্তিতে বাস করিতেছি, একথা কাহারও অস্বীকার করিবার যো নাই।... কিন্তু আমাদের উচ্চশিক্ষিত হিন্দু ভ্রাতৃগণ তাহা বুঝিয়াও বুঝিতেছেন না।

...গভর্নমেন্ট রাজকার্যের সুবিধার জন্য বঙ্গদেশে দুইজন বা তিনজন লেপ্টেনান্ট গবর্নর নিযুক্ত করিলে তাহাতে তোমার আমার কী?' ...সেপ্টেম্বর ১৯০৫-এর তীব্র গণআন্দোলনের মুখে এখানে মওআ'জ-এর এই কণ্ঠস্বর একাজনের ছিল না— বঙ্গভূমির সমস্ত মুসলমানই এরকম ভেবেছিলেন। মুষ্টিমেয় কিছু মুসলমান অংশ নিয়েছিলেন। মওআ'জ-সাহেব তাদের উদ্দেশ্যে লিখেছেন : যে সকল বিকৃতমনার ও অদূরদর্শী মুসলমান এই গোলমালে হিন্দুদিগের সহিত যোগদান করিয়াছেন, তাহারা হয় ভণ্ড কাপুরুষ, নয় ঘোর মূর্খ।...'

এখানে মওআ'জ মনে করেছিলেন বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন হিন্দু জমিদার, সংবাদপত্র পরিচালকদের ভাষ্য অনুসারে মুসলমানরা চাকরির সুযোগ বেশি মাত্রায় পাবেন— সেজন্য হিন্দুদের গাত্রদাহ ছাড়া কিছু নয়। 'নতুন বঙ্গে মুসলমানগণ অধিক পরিমাণে চাকরি লাভ' করলে হিন্দুদের অসহ্য ঠেকেছে।

২. 'আল এসলাম' পত্রিকায় চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত 'অঞ্জুমান-এ-শুলামা' সম্মেলনের তৃতীয় অধিবেশনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির অভিভাষণ ছাপা হয়েছিল। ফাল্গুন-চৈত্র ১৩৪৫ বঙ্গাব্দ (১৯১৮ খ্রি.)-এর সেই বক্তৃতায় প্রথম বাক্য : '...আরবী ভাষাই আমাদের জাতীয় ভাষা।' পরে 'ইংরেজি আমাদের রাজভাষা' বললেও একটু পরেই বলেছেন : 'উর্দুর নামে আমাদের চটিলে চলিবে না। জাতি হিসেবে উন্নতি লাভ করিতে হইলে উর্দু শিক্ষা করা কর্তব্য।' বাঙ্গলার মুসলমানরা কখনোই এই ধারণা ত্যাগ করেনি। স্বাধীনতা আন্দোলনে তারা অংশ নেয়নি। বাংলাভাষাকে মাতৃভাষা বলে স্বীকার করতে লজ্জা পেয়েছে।

৩. 'আল এসলাম' পত্রিকায় মহম্মদ ওয়াজেদ আলি একটি বিচিত্র মত পোষণ করেছেন একই সংখ্যায়। 'বাংলা ভাষা ও মোছলমান সাহিত্যে' নামে সেই প্রবন্ধে 'জাতীয় ভাষা' বিষয়ে আরবির পক্ষেই সমর্থন জানিয়ে ওয়াজেদ আলি লিখেছেন, 'আমরা বাংলাদেশের অধিবাসী বলিয়া বাঙ্গালি বটে, কিন্তু বাঙ্গালি জাতি নহি।'

পাকিস্তান গঠনের আন্দোলন এই মানসিকতার চূড়ান্ত পরিণতি। তবে ১৯৫২-র ২১ ও ২২ ফেব্রুয়ারির তথাকথিত মাতৃভাষার পক্ষে আন্দোলনটিকে একটি ঐতিহাসিক পরিবর্তন বলে চিহ্নিত করা ভুল। মাতৃভাষা বাংলার জন্য যতটা তার চেয়ে বেশি শঙ্কিত হয়েছিলেন, পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা উর্দু হলে তাদের তরুণ প্রজন্মের কর্মসংস্থান অসম্ভব হয়ে পড়বে। দেশভাগের পর তিন-চার বছরের অভিজ্ঞতা থেকে এই ধারণা স্পষ্ট হওয়া অসম্ভব নয়। 'ভাষা আন্দোলন'-এর পরেও পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষিত মানুষরা মাতৃভাষার প্রতি কতখানি আবেগ বোধ করতেন, তার বেশ কিছু দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। একটু নির্মোহ দৃষ্টি ফেললেই তা প্রমাণিত হবে। কয়েকটি মাত্র উল্লেখ করছি।

(ক) 'মাসিক মোহাম্মদী' দেশ বিভাগের পর পূর্ব পাকিস্তানে চলে যায়। এর কিছু কিছু প্রকাশিত রচনায় পাকিস্তানের সংস্কৃতি ও জাতীয় ভাষা প্রশ্নে কী বলা হচ্ছে, দেখা যাক। ভাদ্র ১৩৬০ বঙ্গাব্দ (১৯৫৩ খ্রি.)-এর সম্পাদকীয় থেকে উদ্ধৃত করছি : 'পূর্ব পাকিস্তানের স্ট্যান্ডার্ড বাংলা কী হইবে, অথবা এখানকার ভাষার রূপ কী হইবে, ইহা লইয়া আপাতত আলোচনা নিষ্প্রয়োজন'...'ফরমায়েশ দিয়া চৌহাদ্দি বাঁধিয়া ভাষার রূপ দৃষ্টি করা যায় না।' উপরন্তু 'পাকিস্তানের ঐক্য ও সংহতি রক্ষার উদ্দেশ্যে উর্দু ভাষাও মোটামুটি জানা প্রয়োজন'। আর 'আরবি' জ্ঞান তো অনিবার্য। এরকম চিন্তা ১৯৫২-র

তথাকথিত 'মাতৃভাষা' আন্দোলনটির অশ্বডিম্ব প্রসব ছাড়া অন্য উপায় ছিল না।

(খ) ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা কার্জন হলে পাঁচদিন ধরে সর্বদলীয় সাহিত্য সম্মেলন হয় এপ্রিল মাসে। উদ্বোধন করেন ড. মুহম্মদ শাহীদুল্লাহ। তাঁর বক্তৃতায় একাধিক জায়গায় ড. শীহদুল্লাহের স্ববিরোধ স্পষ্ট। **গঙ্গাপারের ভাষার শাসন পদ্মাপারের ভাষার উপর চলছে**— এটা তিনি স্বীকার করে নিয়েছেন! আকাশবাণী কলকাতায় ভাষা অনুকরণ-অনুসরণ ছাড়া ঢাকা বেতারের উপায় ছিল না— আজও নেই। বস্তুতপক্ষে ভাষাবিদ ড. শহীদুল্লার সেই বক্তৃতায় তাঁর পর্যবেক্ষণ সুস্পষ্ট করেছেন। আর একটু দেখাই ঃ 'পশ্চিমবঙ্গীয় সাহিত্য বাংলা সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত নয়, একথা কেহই বলে না। বৈষ্ণব সাহিত্যও বাংলা সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু বৈষ্ণব সাহিত্য বা পশ্চিমবঙ্গীয় সাহিত্য বাংলা ভাষাভাষী মুসলমানদের আশা-আকাঙ্ক্ষার, জীবনবোধ ও জীবনাদর্শের ধারক ও বাহক, একথা বোধহয় কেহই বলিবেন না।' সুস্পষ্ট হয়েছে বাহান্নর ভাষা আন্দোলন ছিল একটি বিভ্রান্তি। মুসলমান বঙ্গভাষীদের সংকীর্ণ স্ববিরোধ এবং উর্দু চাপিয়ে দেওয়ার সাময়িক বিরোধিতাও কার্যত তার অসারতা বোঝার ভূমিকা।

একই বক্তৃতায় বিশিষ্ট ভাষাবিদ ড. শহীদুল্লাহ তাঁর ধর্মীয় সংকীর্ণতাকে ভাষা ও সাহিত্য বিচারের উপরে স্থান দিয়েছেন। তাঁর বক্তৃতায় ছিল : 'বঙ্গিমচন্দ্রের নাম বাংলা সাহিত্যে স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু মুসলমান তাঁহার 'বন্দে মাতরম্' সংগীতকে আপন বলিয়া গ্রহণ করে নাই, করিবে না, করিতে পারে না। বিগত হাজার বছরের বাংলা সাহিত্যে দুইটি প্রবহমান ধারা সুপরিস্ফুট, উভয়ই সত্য, উভয়ই বাংলা সাহিত্যের ঐতিহ্য।' এইভাবে তিনি চলে এসেছেন বাংলা সাহিত্য থেকে পাক বাংলা সাহিত্যে। আজ হলে বলতেন, বাংলাদেশি সাহিত্য।

আপাতত বোঝানো গেছে কেন আমরা পশ্চিমবঙ্গ বাংলাভাষা তথা মাতৃভাষা দিবস পালনের পক্ষপাতী। পরিস্থিতি প্রেক্ষাপটে মিল আছে, অমিলও। দাড়িভিট গ্রামের স্কুলে বাংলাভাষার শিক্ষকের পরিবর্তে উর্দু শিক্ষক পাঠানোর উদ্দেশ্য ছিল কদর্য রাজনীতি আর সেই বিষয়ে প্রতিবাদ করতে গিয়ে যে দু'জন তাজা তরুণের মৃত্যু হলো তা পূর্ব পাকিস্তানের ঘটনার তুলনায় কিছুমাত্র কম নয়। পূর্ব পাকিস্তান ছিল মুসলমানদের 'স্বাধীন দেশ'। সেখানে পশ্চিম পাকিস্তানের সরকারি ভাষা উর্দু চাপিয়ে দেবার প্রতিবাদ হয়েছিল। এতে সুস্পষ্ট হয়েছিল মুসলমান ধর্মগোষ্ঠী কোনো মতেই মাতৃভাষাকে সহজ বিকাশের সুযোগ দেয় না। পৃথিবীর কোথাও এমন ঘটেনি— মিশর থেকে মরক্কো, ইরাক থেকে ইন্দোনেশিয়া কোথাও আরবি সাম্রাজ্যবাদী ভাষার অধীন হও নয় শেষ হও— অন্য কোনো মধ্যবিন্দু থাকবে না, থাকতে নেই।

কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষার এমন অবস্থা হলো কীভাবে? দাড়িভিট এই প্রশ্ন তুলে ধরার ইতিহাস। কলকাতার বুকে আমরা দেখি উর্দু ভাষাভাষী অঞ্চলে শাসকদের উর্দুতে লেখা সগর্ব ফেস্টুন ঝলমল করছে! শতকরা দশ ভাগ হলেই উর্দু-অ্যাকাডেমি তৈরি হবে, স্কুলে ছাত্ররা (কিংবা অন্য কেউ!) চাহিদা জানালেই উর্দু পড়াবার শিক্ষক গিয়ে হাজির হবেন। এইরকম রীতি-নিয়ম চালু হয়েছে। একথা জানা বোঝার জন্য দাড়িভিটের দুর্ঘটনা অনিবার্য ছিল। অবশ্য করোনা সংক্রমণ হলে যেমন ঘ্রাণেন্দ্রিয় ও জিহ্বা কাজ করে না— কোনো বস্তুর স্বাদ গন্ধ বোঝা যায় না— পশ্চিমবঙ্গের দুর্বুদ্ধিজীবী ধান্দাবাজ গোষ্ঠী তেমনি শরীরে পিন ফোটালেও নড়ে চড়ে বসেন না। ফলে তাদের উপেক্ষা করেই ২০ সেপ্টেম্বর পশ্চিমবঙ্গ মাতৃভাষা দিবস পালন হচ্ছে। যতদিন যাবে, তত বেশি বেশি করে এই আন্দোলন ছড়িয়ে পড়বে।

কদর্য রাজনীতিকে ঘৃণা করুন। ভোট ভিখারির দল অযোধ্যার বিতর্কিত ধাঁচা ভাঙলে কেঁদে আঁচল, রুমাল বা দাড়ি ভেজায়, কিন্তু মুর্শিদাবাদে আদ্যাশক্তির মূর্তি পুড়িয়ে দিলে ঠোঁটে চাবি দেয়। রবীন্দ্রনাথের নামে বুক ফোলানো কথা বলে কিন্তু পে-লোডার ভাড়া করে শান্তিনিকেতনের প্রাচীর ভূমিসাৎ করে— বখতিয়ার খলজির মতো। তা না হলে ভূগোল-ইংরেজি-ইতিহাস-কম্পিউটার এবং

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের শিক্ষক নেই, কিন্তু প্রধান শিক্ষক অভিজিৎ কুণ্ডু, স্কুল কমিটির সভাপতি নিশাচন্দ্র গণেশ আর তাদের রাজনৈতিক সহযোগী কার্তিক বৈরাগী চেয়ে বসলেন উর্দুর শিক্ষক! সারা রাজ্যে শিক্ষকের অভাবে স্কুলগুলির পঠনপাঠন বন্ধ হবার উপক্রম, কিন্তু রাতারাতি দাড়িভিটে ওই উর্দু-শিক্ষক এসে পড়লেন! স্কুলের শিক্ষক নুরুল হুদার কথা স্থানীয় মানুষের মুখে মুখে ফিরছে। তিনিই নাকি পিছন থেকে কলকাঠি নেড়েছেন।

নীলকমল সরকার শ্রীমতী ঝর্না সরকারের পুত্র রাজেশের কী দোষ ছিল? ছাত্র-ছাত্রীদের বিক্ষোভ চলছে— তখন স্কুল মাঠে পুলিশের গাড়ি এলোমেলো ভাবে পাগলের মতো চলছিল, সকলের পিঠে পড়ছিল এলোপাথাড়ি লাঠি। পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষার সম্মান রক্ষার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পুলিশ বিশেষত স্থানীয় সিভিক পুলিশ গোলাবাড়ি নন্দঝাড়ের মহম্মদ রেজার ভূমিকা ছিল ভয়ংকর। হঠাৎ গুলি চলছে— আওয়াজ শুনে বোন মৌ-কে খুঁজতে ঢুকেছিল দাদা রাজেশ। তার বুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা-পন্থী পশ্চিমবঙ্গ সরকারের গুলি ঢুকে গেল। আমরা দূরদর্শনে সেই ভয়ংকর দৃশ্য দেখলাম।

বাদল বর্মণ ও শ্রীমতী মঞ্জুদেবীর পুত্র তাপস বর্মণের কী দোষ ছিল? স্কুল বাড়ির বাইরে মিষ্টির দোকান তাদের। তাপস দাঁড়িয়েছিল। হঠাৎ উড়ে এল জ্বলন্ত সিসা— তারও পেটে লাগল। রাজেশ সঙ্গে সঙ্গে মারা গেলেও তাপস হয়তো বেঁচে যেত। বিকেল চারটে কী সাড়ে চারটে হবে, অসুস্থ তাপসকে নিয়ে যাবার সময় পথে বার বার উর্দুপন্থী দাড়ি টুপির দল আটকেছে। পরে গোলা বাড়ি নন্দঝাড় এলাকায় লোকজন সশস্ত্র হামলা চালাল! তাপসের ক্ষতস্থানে খোঁচা মারা হয়, শান্তির ধর্মই বটে! শিলিগুড়িতে যেতে যেতেই মাতৃভাষায় আর্তনাদ করতে করতে তাপসের মৃত্যু হয়।

বহু প্রশ্ন উঠে আসে। স্কুলে অভিভাবকরা ধরনায় বসেছিলেন। দাবি সিবিআই-কে দিয়ে তদন্ত করতে হবে। এই দাবিতেই তো জিতে এসেছেন শ্রীমতী দেবশ্রী চৌধুরী! তিনি কি লোকসভায় এ নিয়ে উচ্চবাচ্য করেছেন? সাধারণত হিন্দিতে অভ্যস্ত এই মন্ত্রী। স্থানীয় মানুষের একাংশ কিন্তু হতাশ। কেউ কেউ বলেন, বরং পাশের আসনে জিতে আসা সাংসদ সুকান্ত মজুমদার কিছু বলেছেন বলে শোনা যায়। ৫৭ দিন অবস্থানের পর স্থানীয় জেলাশাসক প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন সিবিআই তদন্ত হবে। হয়নি। কোনো আশাই পূরণ হয়নি।

ধলেঞ্চা নদীর তীরে সমাধি দেওয়া হয়েছে রাজেশ সরকার ও তাপস বর্মণের মরদেহ। আসপাশের গ্রামবাসী আজও ছল ছল চোখে চেয়ে থাকেন— এমন পরিস্থিতির কথা ভেবেই কী স্বাধীনতা এসেছিল? বাঙ্গালি কি আজও ভাষাগত ভাবে স্বাধীন? কেন এভাবে বখতিয়ারের দস্যুদের রক্তের ধারা বহন করা হিন্দু-নামধারী অর্ধশিক্ষিত অহংকারী পরজীবীদের শাসন চলবে? পশ্চিমবঙ্গের মানুষ কি সমবেত ভাবে এই অনন্ত পরাভব ও অন্যায়ের প্রতিবাদ করবে না? হিন্দু বাঙ্গালি কি বেঁচে আছে? নাকি নদী তীরের শ্মশানই তাদের শেষ ঠিকানা? উত্তর দেবার দায় কিন্তু এই সময়ের পশ্চিমবঙ্গবাসীর। ■

নিজের স্বপ্ন গুলোকে বাস্তবে রূপ দিন
মিউচুয়াল ফান্ডে
SIP করুন, উন্নতি করুন
(সিস্টেমেটিক ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যান)
২০০০ টাকা প্রতি মাসে যারা ১৯৯৫ সাল থেকে ২০১৫ পর্যন্ত
SIP-তে নিয়মিত বিনিয়োগ করেছেন তাদের প্রত্যেকের
ফান্ড ভ্যালু বর্তমানে ১.০১ কোটি টাকা, মোট বিনিয়োগ ৪.৮ লাখ টাকা মাত্র।
মিউচুয়াল ফান্ড বিনিয়োগ বাজারের ঝুঁকির শর্তাধীন। যোজনা সংশ্লিষ্ট সমস্ত নথি যত্ন সহকারে পড়ুন।
DRS INVESTMENT
Mutual Fund | Insurance | Fixed Deposit | Bond
কোলকাতা, হাওড়া • Email : drsinvestment@gmail.com
9830372090
9748978406

বিশেষ আবেদন

বর্তমান করোনা মহামারীর ভয়াবহ পরিস্থিতিতে স্বস্তিকা মুদ্রিত আকারে প্রকাশ করা সম্ভব হচ্ছে না। www.eswastika.com এতে ইন্টারনেট সংস্করণ নিয়মিত আপলোড করা হচ্ছে।

স্বস্তিকার সকল প্রচার প্রতিনিধি, পাঠক-পাঠিকা ও শুভানুধ্যায়ীদের প্রতি বিশেষ আবেদন, আপনারা স্বস্তিকার ইন্টারনেট সংস্করণটি আপনার পরিচিতদের মধ্যে হোয়াটস্‌অ্যাপ বা ই-মেলের মাধ্যমে পৌঁছে দিয়ে স্বস্তিকার প্রচারে আমাদের সহযোগিতা করুন। —*ব্যবস্থাপক, স্বস্তিকা*

ALWAYS EXCLUSIVE
Vandana
SAREES • SUITS
Mfg. of Cotton Printed & Embroidary Sarees
Contact No. : 033-22188744 / 1386

দাড়িভিটের ঘটনা দ্বিজাতিতত্ত্বেরই পরিণাম

ড. জিষ্ণু বসু

দাড়িভিটে দুজন নিরাপরাধ ছাত্রের হত্যার পরেও দুটো বছর কেটে গেল। অপরাধীদের কোনো বিচার হলো না। বিচার যে হবে না সেটি রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী শুরুতেই বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। একজন এতবড়ো দায়িত্বশীল মানুষ বললেন যে, ওই বিদ্যার্থী পরিষদের দুটি ছাত্র রাজেশ ও তাপসকে হত্যা করেছে আরএসএস। অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের ভাবাদর্শে অনুপ্রাণিত একটি সংগঠন, এটি শিক্ষামন্ত্রী জানতেন না? রাজেশ সরকার ও তাপস বর্মন নামে দরিদ্র তপশিলি হিন্দু পরিবারের যে দুটি তরতাজা ছেলেকে সেদিন খুন করা হলো, তাদের 'ফরেনসিক ব্যালস্টিক রিপোর্ট' কি এখনও দক্ষিণ দিনাজপুরের পুলিশ প্রশাসনের কাছে জমা পড়েনি? তাহলে হত্যাকারীর নাম বলছেন না কেন মন্ত্রী, সরকার, প্রশাসন? বলছেন না কারণ মন্ত্রীমশাই ২০১৮ সালে ২০ সেপ্টেম্বরেই বুঝেছিলেন, যে কতবড়ো পাপ সেদিন তাঁদের পুলিশ করেছে।

পশ্চিমবঙ্গে বাংলাভাষার শিক্ষকের পরিবর্তে উর্দু ভাষার শিক্ষক পাঠানো হয়েছিল দাড়িভিট উচ্চ বিদ্যালয়ে। কে পাঠিয়েছিলেন? পশ্চিমবঙ্গ সরকার দুটি ছাত্র খুনের ঘটনাকে ধামাচাপা দিতে উত্তর দিনাজপুরের ওই জেলা বিদ্যালয় পর্যবেক্ষককে সাসপেন্ড করেছিল। সেই লোক দেখানো ঘটনার মাত্র তিন মাসের মধ্যে জেলার ডিআই সাহেবের সাসপেন্সন উঠে গেল। তিনি বহাল তবিয়তে রাজ্য স্কুল শিক্ষা দপ্তরের সদর দপ্তর বিকাশ ভবনে চলে এলেন। তার মানে তাঁকে পুরস্কৃত করা হলো। আমরা এমন রাজ্যে বাস করি যে এখানে মানুষ ওই মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করবেন না 'আপনি এত ভয়ানক ঘটনার পরে ওইসব আবোল তাবোল বলেছিলেন কেন?' ডিআই যদি অপরাধী না হন, তবে আপনি পদত্যাগ করবেন না কেন? যে স্কুলে একজনও উর্দুভাষী ছাত্র নেই সেখানে বাংলা বা জীবন বিজ্ঞানের শূন্যপদের বদলে উর্দু শিক্ষক পাঠানো হলো কেন? আসলে এই পাপের গোড়াটা লুকিয়ে আছে দ্বিজাতিতত্ত্বের পাঁকের মধ্যে। উর্দু একটি ভাষা, যে ভাষাতে পশ্চিমবঙ্গে সামান্য কিছু মুসলমান কথা বলেন। এ রাজ্যে সাঁওতালি ভাষাতে কথা বলা মানুষের সংখ্যা উর্দুভাষীদের থেকে অনেকগুণ বেশি। কিন্তু এই রাজ্যে এখন শুরু হয়ে গেছে এক অদ্ভুত প্রবণতা। এই রাজ্যে বহু সরকারি সাইনবোর্ড থাকছে কেবল উর্দু, ইংরেজি ও হিন্দি। যা ভারতের 'ত্রিভাষা সূত্র'-এর একেবারে পরিপন্থী। এই রাজ্যে সব সরকারি সাইনবোর্ডে, বিজ্ঞাপনে বা বিজ্ঞপ্তিতে সবচেয়ে উপরে বাংলা থাকার কথা। সেটাই আইন। তাহলে? এই উর্দুকে নিয়ে এই লোকদেখানো আচরণের কারণ কী? কই পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, ঝাড়গ্রামে অলচিকি হরফে বা সাঁওতালি ভাষাতে কেউ ভুল করেও এমন লেখেন না। এর কারণ

> **রবীন্দ্রনাথের বাংলা, বঙ্কিমচন্দ্রের বাংলা, কাজী নজরুলের বাংলা, জীবনানন্দের বাংলাভাষাকে সাম্প্রদায়িক বা রাজনৈতিক স্বার্থে বলিদান হতে দেওয়া চলবে না। যেসব 'জনাব' রাজনৈতিক ক্ষমতা বলে বাংলাকে সরিয়ে উর্দুকে এই রাজ্যে প্রতিষ্ঠা করতে চাইছেন তাদের বিরুদ্ধে পশ্চিমবঙ্গের ৯ কোটি মুষ্ঠিবদ্ধ হাত তুলে বলতে হবে, 'বাংলা চাই, বাংলা ফিরিয়ে দাও!'**

হলো--- একটি দ্বিজাতিতত্ত্বের ধারণা। মাতৃভাষা হোক না হোক উর্দু একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের ভাষা। বাংলাভাষী এলাকাতে উর্দু শিক্ষক পাঠালে সেই বিশেষ সম্প্রদায়ের খুশি হবারই কথা।

বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধে ঠিক এই প্রশ্নটাই ছিল। ধর্মে মুসলমান হলেও একজন বাংলাভাষীকে কেন জোর করে উর্দু পড়তে হবে? দ্বিজাতিতত্ত্বকে মাটিতে মিশিয়েই ২১ ফেব্রুয়ারি এসেছে। বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরে বহু রাজাকার পশ্চিমবঙ্গে পাকাপাকি ভাবে ঠাঁই করে নিয়েছে। উত্তরবঙ্গ থেকে দক্ষিণবঙ্গ বিভিন্ন ছোটো বড়ো জনবসতিতে এই উর্দুভাষী রাজাকার কয়েক দশক ধরে ঘাঁটি গেড়েছে। এদের অনেকে পূর্বপাকিস্তান থেকে বহু অর্থ নিয়েও এসেছে। আজকের নীতিহীন রাজনৈতিক বাতাবরণে সেইরকম রাজাকাররা বা তাদের পরের প্রজন্ম ক্ষমতার অলিন্দের খুব কাছে এসে গেছে।

আর একটি দল উর্দুভাষী যারা এক প্রজন্ম আগে বিহার বা ঝাড়খণ্ড থেকে কলকাতা বন্দরে বা হাওড়া-হুগলী অঞ্চলে শ্রমজীবী হিসেবে এসেছেন। যে ভাবেই হোক এই গোষ্ঠীর হাতে এখন প্রচুর টাকা হয়েছে। এঁদের প্রতিনিধিও রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রায় শীর্ষে পৌঁছে গেছেন। তাঁরাও আদতে দ্বিজাতিতত্ত্বে বিশ্বাস করেন। মানে বাংলা বা হিন্দি হলে হবে না, উর্দু একটি সম্প্রদায়ের ভাষা হিসেবে মানতেই হবে। এর প্রতিবাদ করলে, বিজেপি বা আরএসএস-কে পিষে মেরে দেবেন এমনটাই ধমকি দেন তাঁরা।

পশ্চিমবঙ্গ ভারতবর্ষের একটি রাজ্য। কোনো রাজনৈতিক দল যদি যোগ্য বাংলাভাষীকে না পান তবে কোনো উর্দুভাষীকে কলকাতার মেয়র বা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীও করতে পারেন। যেটা পারেন না সেটা হলো ওই ভদ্রলোকের নামের আগে 'জনাব' লিখতে। কারণ ওটি বাংলা শব্দ নয়। আমরা কাজী নজরুল ইসলাম, এস ওয়াজেদ আলি বা হাজি মুহম্মদ মোহসীনের নামের আগে 'জনাব' লিখতাম? আমার পশ্চিমবঙ্গে আমি উর্দুতে সম্বোধন কেন করব?

ধীরে ধীরে বাংলা সরে যাচ্ছে, আবার দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে উর্দু থাবা বসাচ্ছে। এই অমোঘ সত্য কথাটি কলকাতার উচ্চশিক্ষিত বুদ্ধিজীবীদের বুঝতে সমস্যা হচ্ছে, কিন্তু উত্তর দিনাজপুরের কলেজ ছাত্র রাজেশ বা তাপসের বুঝতে অসুবিধা হয়নি। দাড়িভিটের ওই স্কুলটিতে মুসলমান ছাত্র সংখ্যা কম। যে কয়েকজন আছে তাদের একজনেরও মাতৃভাষা উর্দু নয়। এখানে পরিষ্কার করে বলা প্রয়োজন যে প্রাচীন ভাষা হিসেবে পশ্চিমবঙ্গের স্কুলে সংস্কৃত বা আরবি পড়ানো হয়। এই উর্দুটি হাল আমলে নতুন করে চাপানো হচ্ছে।

তাই দলমত নির্বিশেষে, সমস্ত ধর্মসম্প্রদায়ের বাংলাভাষী মানুষকে আজ ঐক্যবদ্ধ হওয়া প্রয়োজন। বাংলাটা হিন্দু বা মুসলমান সকলের ভাষা। ধর্মীয় সাহিত্য বা প্রাচীন ভাষা হিসেবে সংস্কৃত বা আরবি কেউ পড়তেই পারেন। কিন্তু বাংলাকে সরিয়ে উর্দুরাজ আসলে দ্বিজাতিতত্ত্বেরই বর্তমান সংস্করণ। রাজেশ ও তাপস এই ভাষা আন্দোলনেরই হুতাত্মা।

তাই রবীন্দ্রনাথের বাংলা, বঙ্কিমচন্দ্রের বাংলা, কাজী নজরুলের বাংলা, জীবনানন্দের বাংলাভাষাকে সাম্প্রদায়িক বা রাজনৈতিক স্বার্থে বলিদান হতে দেওয়া চলবে না। যেসব 'জনাব' রাজনৈতিক ক্ষমতা বলে বাংলাকে সরিয়ে উর্দুকে এই রাজ্যে প্রতিষ্ঠা করতে চাইছেন তাদের বিরুদ্ধে পশ্চিমবঙ্গের ৯ কোটি মুষ্ঠিবদ্ধ হাত তুলে বলতে হবে, 'বাংলা চাই, বাংলা ফিরিয়ে দাও!' যে সরকারি সাইনবোর্ডে বাংলা নেই, সেখানে ভারত সরকারের 'ত্রিভাষা সূত্র' অমান্য করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে বাংলা থাকতেই হবে। এমন ঘটনা দেখলে সংশ্লিষ্ট আধিকারিককে বলুন, দেশের আইন সবার উপরে। রাজনৈতিক বা মৌলবাদী চাপ আইনের উপরে নয়। রাজেশ ও তাপসের মৃত্যু আমাদের আমাদের চোখ খুলে দিয়েছে। এখনো যদি আমরা সচেতন না হই, তবে পশ্চিমবঙ্গ নামটাই থাকবে, বঙ্গসংস্কৃতি থাকবে না। ▌

২০ সেপ্টেম্বর-পশ্চিমবঙ্গ মাতৃভাষা দিবস উদযাপন

ড. তরুণ মজুমদার

শুধুমাত্র ভাষার পরিপ্রেক্ষিতে একটি জাতি গড়ে উঠতে পারে কি? হয়তো না। সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, ভাষা এবং ভূখণ্ডের সামগ্রিক মেলবন্ধনের পরিপ্রেক্ষিতে একটি জাতি গঠিত হয় যেখানে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের পরিসর ব্যাপক। প্রায় হাজার খ্রিস্টাব্দের পূর্বে সৃষ্টি হওয়া প্রাচীন বাংলা লিপি, কালের নিয়মে অনেক রদবদলের মধ্য দিয়ে এসেছে। সৃষ্টি হয়েছে নিজস্ব বর্ণমালা। সনাতন ভারতীয় সংস্কৃতির মধ্যে জন্ম ও বিকশিত হওয়ায় স্বাভাবিক ভাবেই বাংলা ভাষায় সংস্কৃতের প্রাধান্য লক্ষণীয়। এই একই কারণে শুষ্ক মরু-সংস্কৃতিতে জন্ম ও বেড়ে ওঠা ইসলাম, বাংলা ভাষায় ততটা ঢুকতে পারেনি। বাংলা ভাষার প্রকৃত উৎস সংস্কৃত ভাষা হওয়ার কারণে সেখানে তৎসম শব্দের প্রভাব অত্যন্ত বেশি। যদিও কালের নিয়মে তদ্ভব এবং অসংখ্য বিদেশি শব্দের প্রবেশ ঘটেছে। কিন্তু সেগুলি সাবলীলভাবেই বাংলা ভাষায় আত্তীকৃত হয়েছে, কখনোই তা বলপূর্বক হয়নি। দুর্ভাগ্য যে, এই একবিংশ শতাব্দীতে এসেও আমাদের অসহনীয় ভাষা জিহাদের সম্মুখীন হতে বাধ্য করা হচ্ছে শুধুমাত্র নির্লজ্জ সস্তা রাজনীতির কারণে। নিজ ঋদ্ধ ঐতিহ্যমণ্ডিত শব্দগুলিকে বলপূর্বক পরিবর্তিত করে সেখানে বিজাতীয় শব্দ প্রবেশ করানো হচ্ছে। হাজার হাজার মানুষের জীবনের বিনিময়ে আরব সাম্রাজ্যবাদের করাল গ্রাস থেকে ছিনিয়ে এনে বাঙ্গালি হিন্দুদের স্বাধীন ভাবে শ্বাস নিয়ে বেঁচে থাকার শেষ আশ্রয়স্থল এই পশ্চিমবঙ্গে সরকারি মদতে শুরু হয়েছে আরবি সাংস্কৃতিক আগ্রাসন ও ভাষা জিহাদ। সস্তা রাজনৈতিক স্বার্থ ও নির্লজ্জ ভোট তৃষ্ণা মেটানোর তাগিদে নিজেদের হিন্দু শিকড়কে অস্বীকার করে এক পৃথক আইডেন্টিটি প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে ক্রমাগত বলপূর্বক বিজাতীয় আরবি-ফারসি শব্দের অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে বাংলা ভাষাকে সংস্কৃতবর্জিত করে তার ইসলামিকরণের দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

কবিগুরুর ভাষায় বলতে, হয়, ‘‘আজকের বাংলা ভাষা যদি বাঙ্গালি মুসলমানদের ভাব সুস্পষ্টভাবে ও সহজ ভাবে প্রকাশ করতে অক্ষম হয়, তবে তারা বাংলা পরিত্যাগ করে উর্দু গ্রহণ করতে পারেন। সেটা বাঙ্গালি জাতির পক্ষে যতই দুঃখকর হোক না, বাংলা ভাষার মূল স্বরূপকে দুর্ব্যবহারের দ্বারা নিপীড়িত করলে সেটা আরও বেশি শোচনীয় হবে। বাংলা ভাষায় সহজেই হাজার হাজার আরবি শব্দ চলে গেছে। তার মধ্যে আড়াআড়ি বা কৃত্রিম জেদের লক্ষণ নেই। কিন্তু যেসব ফারসি আরবি শব্দ সাধারণ্যে অপ্রচলিত অথবা হয়তো কোনো এক শ্রেণীর মধ্যে বদ্ধ তাকে বাংলা ভাষার মধ্যে প্রক্ষেপ করাকে জবরদস্তি বলতেই হবে। হত্যা অর্থে খুন ব্যবহার করলে বেখাপ হয় না, বাংলার সর্বজনের ভাষায় সেটা বেমালুম চলে গেছে। কিন্তু রক্ত অর্থে খুন চলেনি, তা নিয়ে তর্ক করা নিষ্ফল।’’ আজকের বর্তমান পশ্চিমবঙ্গে এই ভাষা জিহাদের অশুভ প্রচেষ্টা উৎকট ভাবে প্রতীয়মান হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গে আরব সাম্রাজ্যবাদী ও তাদের রাজনৈতিক মদতদাতারা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে সম্পূর্ণরূপে বাদ দিয়ে শুধুমাত্র ভাষাভিত্তিক বাঙ্গালি জাতিতত্ত্বকে সামনে রেখে এবং মুখে জয়বাংলা স্লোগান তুলে সুকৌশলে বৃহৎ বাংলাদেশ গড়ার ষড়যন্ত্রকে সফলতার দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার অপচেষ্টা চালাচ্ছে। এই প্রসঙ্গে আওয়ামি লিগের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য মৌলনা ভাসানীর সেই কুখ্যাত উক্তিটি স্মরণীয়... ‘‘ আসাম আমার, পশ্চিমবঙ্গ আমার, ত্রিপুরাও আমার। এগুলো ভারতের কবল থেকে ফিরে না পাওয়া পর্যন্ত বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও মানচিত্র পূর্ণতা পাবে না।’’ এই আক্ষেপ থেকে সৃষ্টি হওয়া ষড়যন্ত্রের অঙ্গরূপে আমরা দেখতে পাই বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে স্কুলপাঠ্য থেকে আকাশ শব্দটি মুছে দেওয়া হয়েছে পরিবর্তে এসেছে আসমান। রামধনুর পরিবর্তে এসেছে রংধনু। কিন্তু এই তোষণমূলক রাজনীতির কারণে সাধারণ বাঙ্গালিকে কেন ঐতিহ্যচ্যুত হতে হবে? কেনই বা বলপূর্বক বাংলার পরিবর্তে উর্দু শিখতে হবে?

২০ সেপ্টেম্বর পশ্চিমবঙ্গ মাতৃভাষা দিবস পালনের মধ্য দিয়ে রাজ্যজুড়ে মাদ্রাসায় আরবি শিক্ষা বন্ধের সময়োপযোগী দাবি উঠুক, কারণ বুকে মরু সংস্কৃতি ধারণ করে আর যাই হোক বাঙ্গালি হওয়া যায় না। বৃহত্তর ষড়যন্ত্রের অঙ্গ হিসেবে বয়ে চলা এই ভাষাজিহাদ পরাভূত হোক, বাঙ্গালির গর্ব বাংলাভাষা শুদ্ধ হোক।

উত্তর দিনাজপুর জেলার ইসলামপুর মহকুমার দাড়িভিট গ্রামের হাইস্কুলে বাংলা ভাষা ও বিজ্ঞানের শিক্ষক নিয়োগের দাবি ছিল ছাত্র-ছাত্রীদের। অদ্ভুতভাবে স্কুল শিক্ষা দপ্তর পাঠালো উর্দু ও সংস্কৃতের শিক্ষক। অবাঞ্ছিতভাবে উর্দু শিক্ষকের নিয়োগকে একটু সহনশীল করার খাতিরে হয়তো সুচতুরভাবে সংস্কৃত শিক্ষক নিয়োগের প্রচেষ্টা, অথচ স্কুলটিতে অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রীই বাঙ্গালি হিন্দু, একই সঙ্গে ১০ শতাংশেরও কম মুসলমান পড়ুয়া এবং তাদেরও সবাই বাংলাভাষী। স্কুলটিতে উর্দুভাষী ছাত্র একজনও ছিল না। স্বভাবতই এই অনাকাঙ্ক্ষিত এবং অযাচিতভাবে চাপিয়ে দেওয়া উর্দু-শিক্ষা ছাত্র-ছাত্রী ও তাদের অভিভাবকরা মেনে নিতে পারেননি। শুরু হয় গণতান্ত্রিক আন্দোলন। বাংলা ভাষাকে অবদমিত করে বিজাতীয় উর্দু ভাষাকে অগ্রাধিকার দেওয়ার অপচেষ্টাকারী আরব সাম্রাজ্যবাদের দালালরা তাদের মিনি পাকিস্তান তৈরির প্রাথমিক ষড়যন্ত্রে গণতান্ত্রিকভাবে বাধা পেয়ে আতঙ্কিত হয়ে ওঠে।

চক্রান্তকারী প্রমাদ গুনলো, তার ফলস্বরূপ ২০১৮-র ২০ সেপ্টেম্বর প্রায় বিনা প্ররোচনায় পুলিশ গুলি চালালো। বাংলা ভাষার শিক্ষক চেয়ে এই পশ্চিমবঙ্গে প্রাণ হারালেন রাজেশ সরকার ও তাপস বর্মন। পশ্চিমবঙ্গবাসী অবাক বিস্ময়ে দেখল, একটি স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী ও গ্রামবাসীদের সম্পূর্ণ নিরস্ত্র গণতান্ত্রিক আন্দোলনের উপর পৈশাচিক সরকারি সন্ত্রাস। কিন্তু দাড়িভিট স্কুলে কী এমন হলো যে পুলিশকে গুলি চালাতে হলো? দাড়িভিট আন্দোলনকারীদের তরফ থেকে কোনো বোমা পড়েনি, পুলিশের গাড়িও পুড়িয়ে দেওয়া বা জলে ফেলে দেওয়া হয়নি, তবুও সরকারের পুলিশ গুলি চালালো! অথচ আমরা দেখেছি, ২০১৭ সালের ১৭ জানুয়ারি মুসলমান অধ্যুষিত ভাঙড়ের পাওয়ার গ্রিড নির্মাণ নিয়ে বিরোধিতায় সেখানকার মানুষ পথ অবরোধ করে। পুলিশ প্রশাসন তা সরাতে গেলে তাদের উপর আক্রমণ নেমে আসে। দশটি পুলিশভ্যান পুকুরে ফেলে দেওয়া হয়, কিছু আগুন ধরিয়ে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। অনেক পুলিশকর্মী আহত হন, অনেকে তাদের উর্দি খুলে প্রাণ রক্ষার্থে পালিয়ে যান। তবুও কিন্তু পুলিশ ভাঙড়ে গুলি চালায়নি। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠে, ছাত্রদের উর্দুর পরিবর্তে বাংলা পড়তে চেয়ে সমবেত হয়ে গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে এত ভয় কেন? বিনা প্ররোচনায় এতটা অসহিষ্ণুতা কেন?

বলপূর্বক উর্দু আগ্রাসনের মাধ্যমে মিনি-পাকিস্তান বানানোর ষড়যন্ত্র বাধাপ্রাপ্ত হওয়ায় কি এই অসহিষ্ণুতার প্রকৃত কারণ? রাজেশ ও তাপসের এই পৈশাচিক হত্যা কিন্তু নিছক ছাত্র হত্যা বা আর পাঁচটা রাজনৈতিক হত্যার সমগোত্রীয় নয়। বৃহৎ বাংলাদেশ গড়তে চাওয়ার কারিগরদের এ এক সুনিপুণ চক্রান্ত। বাঙ্গালি হিন্দুকে তার নিজভূমে পরবাসী করার ষড়যন্ত্রের অঙ্গ। সনাতনী ঐতিহ্য স্বরূপ শিকড়টিকে জাতির জীবন থেকে ছিন্ন করার এই অপপ্রয়াস আজ পশ্চিমবঙ্গে সর্বত্র বিরাজমান। ভোট ব্যাঙ্কের জন্য শাসকের নির্লজ্জ তোষণের ফল ভুগতে হচ্ছে রাজ্যের আপামর বাঙ্গালি ঐতিহ্য ও বাংলাভাষা প্রেমী নাগরিকদের। সীমাহীন জিহাদি তোষণ ও নিজ সুপ্রাচীন সনাতনী ঋদ্ধ ঐতিহ্যের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতায় অনন্য এই প্রতিকূল পরিবেশে শুধুমাত্র বাংলা ভাষার দাবিতে উত্তর দিনাজপুরের একটি প্রত্যন্ত গ্রামের দুই কিশোরের আত্মবলিদান বিদ্রোহের স্ফুলিঙ্গ স্বরূপ। মৃত্যুঞ্জয়ী হয়ে উঠুক এই আত্মবলিদান। দাড়িভিট আন্দোলন বাংলা ভাষা ও সনাতনী বাঙ্গালি ঐতিহ্যকে সকলের সামনে নতুন আঙ্গিকে তুলে ধরার সুযোগ তৈরি করে দিয়েছে। দাড়িভিটে ভাষা আন্দোলনের স্মারক নির্মাণের মাধ্যমে প্রতিবাদের আওয়াজ দৃঢ়ভাবে প্রজ্বলিত হোক। ২০ সেপ্টেম্বর পশ্চিমবঙ্গ মাতৃভাষা দিবস পালনের মধ্য দিয়ে রাজ্যজুড়ে মাদ্রাসায় আরবি শিক্ষা বন্ধের সময়োপযোগী দাবি উঠুক, কারণ বুকে মরু সংস্কৃতি ধারণ করে আর যাই হোক বাঙ্গালি হওয়া যায় না। বৃহত্তর ষড়যন্ত্রের অঙ্গ হিসেবে বয়ে চলা এই ভাষাজিহাদ পরাভূত হোক, বাঙ্গালির গর্ব বাংলাভাষা শুদ্ধ হোক। ■

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের মুখপত্র

প্রণব

পড়ুন ও পড়ান

With Best Compliments from -

A Well Wisher

বিশেষ রচনা

আত্মবিশ্বাসী ভারতের তীব্র প্রতিরোধের সম্মুখীন চীন

সঞ্জয় সোম

কথায় বলে ইতিহাস বদলাতে পারে কিন্তু ভূগোল নাকি পালটায় না। চীন ও তার করদ রাজ্য পাকিস্তান প্রমাণ করে দিয়েছে যে, প্রতিপক্ষ দুর্বল হলে আন্তর্জাতিক সীমানা নিয়ে যা ইচ্ছে তাই করা যায়। ভারতের সঙ্গে চীনের কোনো সীমানা ছিল না। তিব্বত দখল করে চীন নিজে নিজেই ভারতের প্রতিবেশী হয়ে উঠেছে। অন্যদিকে, পূর্বতন জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের কাশ্মীর উপত্যকার একটা অংশ এবং গিলগিট বালতিস্তান দখল করে পাকিস্তান বস্তুত ভারত-আফগানিস্তান সীমানাটাই মুছে দিয়েছে। ১৯৬২-তে চীন-ভারত যুদ্ধে ভারতের হারের পর চীন লাদাখের আক্সাই চীন অঞ্চলটি দখল করে এবং সেটিকে দু'ভাগ করে তাদের শিনশিয়াং ও তিব্বত রাজ্যের সঙ্গে জুড়ে দেয়। এই আক্সাই চীন প্রায় ভুটানের সমপরিমাণ ভূভাগ। উপরন্তু ১৯৬৩ সালে অধিকৃত কাশ্মীরের শক্সগম উপত্যকা পাকিস্তান চীনকে ভেট করে দেয়, যার ভূভাগের পরিমাণ প্রায় ৫০০০ বর্গকিলোমিটার।

ভারতের তৎকালীন সরকারের ভীরুতা এবং ভুল বিদেশ ও সামরিক নীতির ফলে এতদিন ভারতকে এইসব লোকসান মুখ বুজে সহ্য করতে হয়েছে। চীনের নিজের অতিলোভের কারণেই এবার হয়তো ভারতের সামনে মূল ভূগোলকে পুনর্বহাল করার সুযোগ এসেছে। তাই ভারত-চীন ও পাকিস্তানের মধ্যে নতুন করে যে যুদ্ধকালীন পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে, তার প্রেক্ষাপটটি একবার বুঝে নেওয়া প্রয়োজন।

যারা ভারত-চীন সম্পর্কের অবনতির বিষয়ে অবগত তাঁরা জানেন যে এ বছর মার্চ-এপ্রিল মাসে চীনের রেড আর্মি গালোয়ানে ঢোকার পর থেকে ভারত কিন্তু শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের যথেষ্ট সুযোগ চীনকে দিয়েছে। চীনের পক্ষ থেকে সাড়ে তিন মাসের ইচ্ছাকৃত টালবাহানার পর আসন্ন শীতের কারণে এবং রেড আর্মির ক্রমাগত প্ররোচনার মুখে, শুধুমাত্র বার্তায় সময় নষ্ট করা হয়তো সম্ভবপর হবে না এবং সেক্ষেত্রে বাধ্য হয়েই ভারতকে সামরিক প্রস্তুতি চূড়ান্ত করতে হয়েছে।

মনে রাখতে হবে যে, কিছুদিন আগে আমাদের ২০ জন জওয়ানের শহিদ হওয়া কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, সুপরিকল্পিত একটি চীনা রণকৌশলের ফল। আসলে চীন ইচ্ছে করেই চীনা ভাইরাসের প্রকোপের ফলে ভারতের অর্থনৈতিক দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে এই পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে। ওদের ঘোষিত নীতি অনুযায়ী ওরা ২০৪৯-এর মধ্যে পৃথিবীর সর্ববৃহৎ সামরিক এবং অর্থনৈতিক শক্তি হতে চায়। চীন জানে যে তাদের এই প্রভুত্ববাদী তথা বিস্তারবাদী পদক্ষেপের ক্ষেত্রে প্রধান অন্তরায় হচ্ছে ভারতের বর্তমান সরকার।

এক্ষেত্রে কয়েকটি বিষয় মনে রাখা প্রয়োজন :

১. পৃথিবীর বৃহত্তম শক্তি হতে গেলে চীনকে আগে এশিয়ায় সর্ববৃহৎ শক্তি হতে হবে।

২. এশিয়ার সর্ববৃহৎ শক্তি হতে গেলে সবচেয়ে আগে দক্ষিণ এশিয়ার বৃহত্তর শক্তি হতে হবে।

৩. দক্ষিণ এশিয়ার বৃহত্তম শক্তি হতে গেলে অরুণাচল প্রদেশ

থেকে নিয়ে গিলগিট বালতিস্তান অবধি গোটা হিমালয়ের নিয়ন্ত্রণ চীনের হাতে রাখতে হবে, কারণ এখান থেকেই সমস্ত প্রধান নদীর উৎপত্তি এবং জলের উৎসের উপর দখল থাকা মানেই দক্ষিণ এশিয়ার সমস্ত দেশকে বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য করা।

৪. একই যোজনা অনুযায়ী পূর্ব এশিয়ায় জাপান পর্যন্ত সবকটা দেশকে বশ্যতা স্বীকার করানোর উপায় হলো সাউথ চায়না সি'র ওপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ কায়েম করা, এবং

৫. পশ্চিম এশিয়ার দেশগুলোর ওপর আধিপত্য বাণিজ্যিক যাত্রাপথের ওপর নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে সম্ভব, যা কোটি কোটি ডলারের বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভের মাধ্যমে চীন নিরন্তর করে চলেছে।

এশিয়াকে বশীভূত করার কয়েক দশক ব্যাপী বিস্তৃত প্রক্রিয়ার সময়ে কোনো সামরিক হস্তক্ষেপের ফলে যদি চীনের জন্য প্রশান্ত মহাসাগর থেকে ভারত মহাসাগরের প্রবেশপথ মালাক্কা স্ট্রেট অবরুদ্ধ হয়ে যায় এবং ভারত মহাসাগর দিয়ে চীনা জাহাজ চলাচল ব্যাহত হয় তাহলে তাদের অন্যতম বিকল্প হলো সিপেকের মাধ্যমে পাকিস্তানের গোয়াদার পোর্ট থেকে সামুদ্রিক বাণিজ্যপথের যোগাযোগ। এমতবস্থায় গোয়াদারে পৌঁছোনোর সহজতম রাস্তা হচ্ছে ভারতের লাদাখে অবস্থিত কারাকোরাম পাস, যা গিলগিট বালতিস্তান দিয়ে ঘুরে যাওয়া কেবল গ্রীষ্মকালীন রাস্তার চেয়ে প্রায় ১৫০০ কিমি কম এবং সারা বছর ব্যবহারের উপযোগী। বহু দশক ধরে ভারত বিভিন্ন সময়ে লাদাখে নিয়ন্ত্রণ রেখা নির্দিষ্ট করার জন্য চীনের সঙ্গে বার্তালাপ করেছে কিন্তু চীন কিছুতেই রাজি হয়নি। আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণ রেখা একবার নির্দিষ্ট হয়ে গেলে সেটা লঙ্ঘন করা মুশকিল। এইবার সেই অনির্দিষ্ট নিয়ন্ত্রণরেখার সুযোগ নিয়েই ওরা কারাকোরাম দখলের উদ্দেশ্যে লাদাখে সামরিক অভিযান শুরু করেছে। তবে পার্থক্য এটাই যে এবার চীন আত্মবিশ্বাসী ভারতের তীব্র প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়েছে।

আসলে ভারত সম্পর্কে কয়েকটি পুরানো ধ্যানধারণার বশবর্তী হয়েই চীন এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে মনে হয়। প্রথমত, চীনা কমিউনিস্ট সরকার বহুদিন ধরেই ভারতীয় রাজনীতিতে প্রভাব খাটিয়েছে এবং আংশিকভাবে সফলও হয়েছে। একশ্রেণীর দালাল ভারতীয় সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবী, অধ্যাপক এবং রাজনেতার মাধ্যমে চীন নিরন্তর সনাতন ভারত বিরোধী জনমত তৈরি করার চেষ্টা চালিয়েছে। চীন ভেবেছিল যে অর্থনৈতিক কারণে ভারতীয়দের মধ্যে বর্তমানে এতটাই অসন্তোষ সৃষ্টি হয়েছে যে এই মহামারীর সময়ে চাপ আরও বাড়লে সরকারের বিরুদ্ধে ব্যাপক জনরোষ তৈরি হবে। দ্বিতীয়ত, চীনের ধারণা ছিল যে কোভিড-বিপর্যস্ত ভারতীয় অর্থনীতিকে চালু রাখতে গেলে চীনের সঙ্গে ৫৯ বিলিয়ন ডলারের বাণিজ্য ঘাটতি সত্ত্বেও ভারতকে চীনের সস্তা পণ্যের ওপরেই নির্ভর করতে হবে। ফলে চীনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সামরিক সমরে নামার দুঃসাহস ভারত করবে না। তৃতীয়ত, স্বৈরতন্ত্রী আত্মতুষ্ট কমিউনিস্ট পার্টি ধরেই নিয়েছিল যে চীনের ক্রমবর্ধমান সমৃদ্ধি ও শক্তি সঞ্চয় অবশ্যম্ভাবী জেনে ভারতের চীন বিরোধিতা কখনোই মাত্রাছাড়া হতে পারবে না। ওরা এখানেই মস্ত বড়ো ভুল করেছে। ওরা বর্তমানের ভারত এবং শাসকদল বিজেপিকে চিনেতে পারেনি। ১৮টি বৈঠকের পরেও চীনের সর্বোচ্চ নেতা শি জিন পিং-এর চরম অক্ষমতা যে তিনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর মনও বুঝতে পারেননি।

ফিরে যাওয়া যাক ১৯৯৮-তে, তখন ভারতের সদ্য নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ী। তার মাত্র সাত বছর আগে ভারতীয় অর্থনীতির এমন দৈন্যদশা হয়েছিল যে, দেশের সোনা বন্ধক রাখতে হয়েছিল। তখন পরিস্থিতি যে আমূল শুধরে গিয়েছিল, এমনটাও নয়। কিন্তু বাজপেয়ীজী গদিতে বসেই পোখরানে পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটিয়ে ভারতকে পারমাণবিক রক্ষাকবচের আওতায় নিয়ে এলেন। তিনি জানতেন এর ফলে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিশ্বব্যাপী ব্যাপক অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞার সম্মুখীন হতে হবে এবং ভারতের পক্ষে সেই চাপ সামলানো খুব কঠিন হবে, কিন্তু তাতে তাঁর সিদ্ধান্ত এতটুকুও বদলায়নি। চীনের বোঝা উচিত ছিল যে, বিজেপির জাতীয়তাবাদী সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি অন্যান্য দলের সরকারের সঙ্গে মেলে না। যেখানে দেশের সুরক্ষা, সার্বভৌমত্ব এবং স্বাধীনতার প্রশ্ন জড়িত, সেখানে বিজেপি আপোশ করে না।

ক্ষমতার মোহে চীন আরও কয়েকটি দরকারি কথা ভুলে গেছে। ওরা ভুলে গেছে যে, আত্মনির্ভর ভারত গড়ে তোলার লক্ষ্যে চীন থেকে ব্যাপক আমদানি বস্তুত বিরাট প্রতিবন্ধকতা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ওরা ভুলে গেছে যে, তিব্বতের অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ভারতে আশ্রিত, স্বয়ং দলাইলামা ভারতে আশ্রিত, বিশেষ তিব্বতীয় সীমান্তবাহিনী ভারতীয় সেনার অধীন এবং তিব্বত তথা হিমালয়ের ওপর চীনের নিয়ন্ত্রণ আসলে নেহরুর অদূরদর্শিতার ফসল। ওরা ভুলে গেছে যে, ভারত কোয়াডের সদস্য এবং চীনের খাদ্য সুরক্ষাও বহুলাংশে কোয়াডভুক্ত দেশগুলির ওপর নির্ভরশীল। ভুলে গেছে যে, সমুদ্রপথের ওপর চীনের দখলদারির হাতিয়ার স্ট্রিং অব পার্লসকে দক্ষিণ এশিয়ায় নির্বিষ করে দিয়েছে ভারত।

বরং উলটো দিকে আজ ভারতীয় রণতরী সাউথ চায়না সি'তে টহল দিচ্ছে এবং ভারতীয় সেনা গোটা ভারত-তিব্বত সীমান্ত জুড়ে যে ২৭টি যুদ্ধক্ষেত্র তৈরি হতে পারে, তার প্রত্যেকটির প্রতিরক্ষায় সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত।

এমতাবস্থায়, লাদাখের গালোয়ানে সৈন্য-সাঁজোয়া পাঠিয়ে শি জিন পিং যখন ইতিহাসে নাম লেখাতে ব্যস্ত, তখন ভারত সামনে থেকে চীনা বিস্তারবাদের বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী প্রতিরোধের নেতৃত্ব দিচ্ছে। দ্বিপাক্ষিক শান্তি ফেরাতে গেলে এবার কিন্তু অভ্যন্তরীণ নেতৃত্বের সংকট, অর্থনৈতিক মন্দার সংকট, খাদ্যাভাবের সংকট, আন্তর্জাতিক সম্পর্কের সংকট ও জনরোষের সম্মুখীন চীনের কমিউনিস্ট সরকারকেই প্রথমে পিছু হঠতে হবে। ডোকালামে ভুটানের জমি দখল করতে গিয়ে নতুন ভারতের মুখোমুখি হয়ে চীনের বুঝে যাওয়া উচিত ছিল যে, বিনা যুদ্ধে সূচাগ্র মেদিনীটুকুও আর মিলবে না। শি হয়তো মাও জে দং হতে চাইছেন কিন্তু তাঁর দুর্ভাগ্য যে, নরেন্দ্র মোদী ঠিক চাচা নেহরু নন। তাঁর কাছে দেশের মর্যাদা সর্বোপরি, দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষা সর্বোচ্চ প্রাথমিকতা এবং ভারতের স্বাধীনতা সত্যিই অমূল্য। ■

বিশেষ নিবন্ধ

হালাল একটি জিহাদি কৌশলের অর্থনীতি

ড. প্রদোষরঞ্জন ঘোষ

ধর্মপ্রচারে মক্কায় ব্যর্থ হওয়ার পর মদিনায় এসে মুহম্মদ মক্কার অনুসৃত পথ ও কৌশল পরিবর্তন করে সম্পূর্ণ নতুন যে পথ ও কৌশলের পন্থা অবলম্বন করেন সেটাই জিহাদ। আরবি ভাষায় জিহাদ মানে যুদ্ধ। জিহাদ ইসলামের তৃতীয় সিদ্ধান্ত এবং ইসলামের মূল নীতি। তথাকথিত উদারপন্থী উলামা ও বুদ্ধিজীবীদের প্রচার ইসলাম শান্তি, সাম্য ও ন্যায় বিচারের ধর্ম। তাদের মতে ইসলামি জিহাদ আধ্যাত্মিক যুদ্ধ অর্থাৎ নিজের মধ্যেকার অমানুষটিকে হত্যা করে সৎ ও সুন্দর মানুষ হওয়ার যুদ্ধ, কিন্তু বাস্তবে তা সম্পূর্ণরূপে অবাস্তব, মনগড়া এবং পরিকল্পিত মিথ্যাচার ব্যতীত অন্য কিছু নয়। লন্ডনস্থিত বুদ্ধিজীবী খালিদ ওমরের কথায়, ‘Islam is a strong militarised political oppressive system.’

কোরান ও হাদিস অনুসারে পৃথিবীর সমুদয় সম্পত্তির মালিক আল্লা ও তার রসুল মহম্মদ। সেজন্য পৃথিবীব্যাপী কাফেরদের (অমুসলমান) সমস্ত সম্পত্তি আল্লার আওতায় নিয়ে আসতে জিহাদ। সেই কারণে জিহাদ হলো ইসলামের সর্বোচ্চ পুণ্যের কাজ। ইসলাম পূর্ণরূপের একটি রাজনৈতিক মতাদর্শ। ইসলামের মূল উদ্দেশ্য সমগ্র পৃথিবীকে ইসলামের সাম্রাজ্যে পরিণত করা। জিহাদ হলো ওই লক্ষ্য পূরণের সামরিক অঙ্গ। জিহাদ একপ্রকার সহিংস রাজনৈতিক আগ্রাসন। সমস্ত উলেমারা (মুসলমান পণ্ডিত) একমত যে ইসলামের সর্বোচ্চ আদর্শ হলো জিহাদ। সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা করে সমগ্র পৃথিবী দখলের উদ্দেশ্যে জিহাদিদের কতকগুলি কৌশল অনুসরণ করতে দেখা যায়—

জিহাদি কৌশলের দুটি দিক। কট্টর কৌশল ও নরম কৌশল। কট্টর কৌশলের মধ্যে জনসংখ্যা জিহাদ, লাভ জিহাদ, ভূমি জিহাদ, শিক্ষা জিহাদ, পীড়িত জিহাদ ও প্রত্যক্ষ জিহাদ। নরম কৌশলের মধ্যে আর্থিক জিহাদ, ঐতিহাসিক জিহাদ, মিডিয়া জিহাদ, ফিল্ম ও সংগীত জিহাদ, আইনি জিহাদ, ধর্মনিরপেক্ষতার জিহাদ।

নরম কৌশলগুলি সাধারণত অলক্ষিত থেকে যায় যদিও এর প্রভাব সুদূরপ্রসারি। আর্থিক জিহাদ হলো ক্রমশ সারা বিশ্বের আর্থিক লেনদেন, ব্যবসা-বাণিজ্য এককথায় সামগ্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে করায়ত্ত করা এবং কাফেরদের পঙ্গু করে বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য করা। সারা বিশ্বকে ইসলামি দুনিয়ার অধীনে নিয়ে আসার লক্ষ্যে তাদের অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদের কর্মসূচি। ঐতিহাসিক জিহাদে ইতিহাসকে ভণ্ড ইতিহাসবিদদের দিয়ে বিকৃত করে নিজেদের অনুকূলে ঐতিহাসিক তথ্যগুলিকে, যেমন মুঘলবাদশাদের ও মুসলমান শাসনের কার্যকালকে মহানরূপে প্রকাশ করার চক্রান্ত। এটা আমাদের দেশে ভালোমতোই হয়ে আসছে। মিডিয়া জিহাদে দালাল সংবাদমাধ্যম ও সংবাদদাতাদের অর্থের বিনিময়ে ইসলামি নীতিগুলির পক্ষে গুণগান করানো। ফিল্ম ও সংগীত জিহাদ হলো প্রভাব বিস্তারের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম যার দ্বারা মুসলমান নবাব বাদশাদের জীবনযাত্রা, নীতি এবং মুসলমান সমাজের ব্যক্তি ও ব্যবস্থাকে উত্তম বলে তুলে ধরার কৌশল। আইনি জিহাদ ইদানিং শুরু এক নতুন জিহাদ, এফআরআই জিহাদ হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে ভারতের ক্ষেত্রে। পরিশেষে ধর্মনিরপেক্ষতার আড়ালে একপেশেভাবে বাম ও তথাকথিত মুক্তমনা ব্যক্তিত্বদের দিয়ে প্রভাব বিস্তারের পরিকল্পনা।

> **একদাকালে নিষিদ্ধ প্রসাধনী বস্তুগুলিও কিন্তু হালাল অর্থনীতির প্রসার করতে গিয়ে বিশ্বজুড়ে প্রতিযোগিতায় প্রথিতযশা কোম্পানি উৎপাদিত বস্তুর উপর চড়া কর আদায়ের মাধ্যমে হালাল শংসাপত্র স্বীকৃতি দেওয়া হয়।**

অন্যদিকে কট্টর জেহাদি পথে মুসলমান জনসংখ্যা বৃদ্ধি (জনসংখ্যা বৃদ্ধি জিহাদ), একাধিক বিবাহ ও সন্তান উৎপাদনের দ্বারা সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের পন্থা। ‘লাভ জিহাদ’ কাফেরদের (এখানে হিন্দু) সমাজ থেকে মেয়েদের ফুসলিয়ে অথবা জোর করে বিবাহ ও ধর্মান্তরিত করা। এভাবে মুসলমান জনসংখ্যা বাড়ানো যা অহরহ মুসলমান বহুল দেশগুলিতে (যেমন বাংলাদেশ, পাকিস্তান) হয়ে আসছে, এমনকী ভারতের কয়েকটি অঙ্গরাজ্যেও (যেমন কেরল, পশ্চিমবঙ্গ ইত্যাদি)। জমিজমা বিষয়আশয় দখল করে বা কেড়ে নিয়ে মসজিদ, মাদ্রাসা ও কবরস্থান গড়ে তোলা ভূমি জিহাদের কৌশল। ইসলামি ভূমি আগ্রাসনে দেখা যায় কোনো উন্মুক্ত স্থানে নমাজ পড়া থেকে ধীরে ধীরে সেই স্থান দখল করে ইদগাহ বা মসজিদ করা হয়। পশ্চিমবঙ্গের সীমান্ত সংলগ্ন জেলাগুলিতে ও অসমে যা ঘটেই চলেছে।

শিক্ষা জিহাদ হলো মাদ্রাসার ব্যাপক বৃদ্ধি ও আরবি ভাষাকে প্রতিষ্ঠা করা যেটা পশ্চিমবঙ্গ ও কেরলে সরকারি আনুকূল্যেই হতে দেখা যাচ্ছে। পীড়িত জিহাদ হলো মুসলমান সমাজকে বঞ্চিত, অবহেলিত দেখিয়ে সংরক্ষণ ও কোটার মাধ্যমে সাহায্য চাওয়া এবং প্রতিষ্ঠিত হওয়ার বাঁকা পথ নেওয়া। অবশেষে সরাসরি বা প্রকাশ্যে জিহাদ ইসলামের গোড়াপত্তনকাল থেকেই সশস্ত্র সংঘাত ও সন্ত্রাসবাদের মাধ্যমে হয়ে আসছে। কিছুদিন আগে কর্ণাটকের নদীতে বিষ মিশিয়ে হত্যা করার চক্রান্ত এক নতুন ধরনের জিহাদ।

হালাল অর্থনীতি বা হালালোনোমিক্স বিশ্বের সবচেয়ে দ্রুতগামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। প্রাক-ইসলামিক আমল থেকেই আরবে 'হালাল' শব্দটি ব্যবহার হয়ে আসছে, যার অর্থ 'অনুমোদিত' অর্থাৎ বৈধ, অন্যদিকে 'হারাম' মানে নিষিদ্ধ। ইসলাম পরবর্তী আমল থেকে 'হালাল' মানে হয়ে গেল 'যা ইসলাম মতে বৈধ' এবং 'হারাম' যা ইসলাম মতে নিষিদ্ধ (সুরা পাঁচ, আয়াত সাতাশি)। শরিয়তি (ইসলাম) নিয়মে পাঁচটি ফরমান জারি বা সিদ্ধন্ত (আর-আহকাম আল খামসা) করা আছে--- ফর্দ (আদেশ), মুশতাহার (সুপারিশের যোগ্য), মুবাহ (নিরপেক্ষ/ উদাসিন), মাকরূহ (নিন্দনীয়/দুষনীয়) এবং হারাম (নিষিদ্ধ)।

হালাল সম্পর্কিত প্রচলিত ধারণা :

প্রধানত প্রচলিত যে হালাল শব্দটি ইসলাম নীতিতে খাবারের প্রয়োজনে, সংশ্লিষ্ট প্রাণীটিকে কীভাবে হত্যা (দাবিহাহ) করা হবে সেই নির্দেশগুলি বা শর্তগুলি নিম্নরূপ :

(ক) প্রাণীর হালালকারী (কসাই) অবশ্যই একজন মুসলমান হতে হবে।

(খ) জবাই/হালালযোগ্য প্রাণীটি অবশ্যই মুসলমানদের বৈধ খাদ্য হতে হবে।

(গ) প্রাণীটি জীবিত, সুস্থ ও রোগমুক্ত এবং জন্ম ও বেড়ে ওঠা এক মুক্ত পরিবেশে হতে হবে।

(ঘ) প্রাণীটিকে জবাই/হালালের আগে ওষুধ প্রয়োগে অজ্ঞান অথবা সংজ্ঞাহীন করা চলবে না।

(ঙ) হালাল করার সময় কসাইকে আল্লার নামে কলমা পড়তে হবে 'বিসমিল্লা আল্লাহ আকবর'।

(চ) হালালের সময় প্রাণীটির মুখ মক্কার কারা অভিমুখে (যে দিকে মুখ করে মুসলমানরা নামাজ পড়ে) রাখতে হবে।

(ছ) জবাই করার নিয়ম : একটি ধারালো অস্ত্রদ্বারা প্রাণীটির গলার শ্বাসনালি, জুগুলার শিরা ও ক্যারোটিভ ধমনী দ্রুত কেটে দিয়ে রেখে দিতে হবে যাতে রক্ত বেরিয়ে যায়, অস্ত্রটি না উঠিয়ে একবারেই কাটতে হবে। আরও বিশদ জানার জন্য ডিএইচসিই হালাল স্টান্ডার্ডে খোঁজ করুন।

হালালোনোমিক্সের ধর্মীয় ভিত্তি :

হালাল ইকোনোমিক্স নিয়ে কোরান ও হাদিসে কোনো নির্দেশ নেই, কিন্তু কোনটা হালাল ও কোনটি হারাম তার নির্দেশ দেওয়া আছে। কোরানের ছাপান্নটি আয়াতে হালাল শব্দটির উল্লেখ আছে যার মধ্যে একটি আয়াত খাদ্যের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত, এর বাইরেরগুলি হারামের অন্তর্ভুক্ত।

হালাল শিল্প ও হালাল শংসাপত্র :

হালাল বস্তু বিক্রির জন্য হালাল শংসাপত্র প্রদানকারী সংস্থা দ্বারা 'হালাল সার্টিফিকেশনের' ব্যবস্থা করা হয়েছে। কোনো বস্তু 'হালাল সার্টিফিকেট' প্রাপ্ত মানে এটা সুনিশ্চিত করে যে ব্যবসার প্রয়োজনে নির্মিত প্রস্তুতকারী সংস্থার দ্রব্য ইসলাম সম্প্রদায়ের মানুষের ব্যবহারের জন্য ইসলামিক শরিয়তি নীতি অনুসারে সংশ্লিষ্ট হালাল শংসাপত্র প্রদানকারী সংস্থা দ্বারা যাচাই ও সত্যাখান। হালাল শংসাপত্রের জন্য বস্তু গুণমান নয়, শুধু তথাকথিত ধর্মীয় নীতিকেই গুরুত্ব দেওয়া হয়।

হালাল সার্টিফিকেট শুধু খাবার জিনিসের উপরই করা হয় না, আজকাল জীবনযাপনের প্রয়োজনীয় বিভিন্ন বস্তুর উপর হচ্ছে। যেমন প্রসাধনী, টুরিজম, ব্যাঙ্কিং, পাবলিশিং, বিনোদন ও গৃহ নির্মাণে হালাল শংসাপত্র চালু হয়েছে। হালাল অর্থব্যবস্থা উৎপাদক থেকে ক্রেতা পর্যন্ত আধিপত্য বিস্তার করতে বাধ্য করছে। হালাল সার্টিফিকেটের নামে ফি (অনেকটা জিজিয়া করের মতো) আদায় করা হয়। আদায়কৃত অর্থ থেকে ইসলামিক অর্থব্যবস্থাকে দৃঢ় করতে এবং জিহাদের কাজে সহায়তা করতে ব্যবহার করা হয়।

নিম্নলিখিত খাদ্যবস্তুগুলি হালাল শংসাপত্রের যোগ্য গণ্য হয়—

(১) দুধ (গোরু, ছাগল, ভেড়া ও উঠ)।

(২) মধু ও আঁশযুক্ত মাছ।

(৩) বিষক্রিয়াহীন গাছপালা।

(৪) তাজা শুকনো ফল।

(৫) কাজু, আলমন্ডের মতো শুকনো ফল।

(৬) দানা শস্য যেমন, চাল, গম ইত্যাদি।

বিপরীতে নিম্নলিখিত বস্তুগুলি হারামের অন্তর্গত—

(১) শুকর, বন্যশুকর ও এইরূপ পশুরা এবং তাদের উপজাত বস্তু, উভচর প্রাণী, যেমন, কুমির, ব্যাং ইত্যাদি। গৃহপালিত পশু, যেমন, গাধা ও খচ্চর।

(২) মাংসাশী প্রাণী যেমন, সিংহ, বাঘ, তীক্ষ্ণ দাঁত ও নখযুক্ত প্রাণী, যেমন, বানর, সাপ, শকুন, ঈগল ইত্যাদি। এছাড়া যেগুলি ইসলাম অনুসারে মারা নিষিদ্ধ, যেমন, পিঁপড়ে, মৌমাছি, কাঠঠোকরা ইত্যাদি।

(৩) বিষাক্ত গাছপালা, বিষাক্ত তরল ও তা থেকে তৈরি বস্তু।

(৪) মানুষ/প্রাণীর রক্ত, প্রস্রাব ও মল এবং অ্যালকোহল ও অ্যালকোহলজাত বস্তু।

(৫) শ্বাসরোধ করে হত্যা করা অথবা মাথায় আঘাতে মৃত্যু পশু এবং স্বাভাবিক ভাবে মৃত পশু, তাছাড়া মাংস কাটার সময় 'বিসমিল্লা...' কলমা পড়া হয়নি এরূপ পশু।

ব্যাতিক্রম 'কোশার' মাংস (ইহুদি পদ্ধতিতে কাটা) নিষিদ্ধ নয়, কারণ পদ্ধতিটি একই এবং যেখানে হালাল মাংস লভ্য নয় সেক্ষেত্রে অহালাল মাংস। হালাল উদ্যোগের একচেটিয়া একাধিপত্য বিকাশের জন্য বর্তমানে অনেক হারাম বস্তুও হালাল করে হয়েছে। যেমন, লাউড স্পিকার, এককালে নিষিদ্ধ প্রসাধনী বস্তুগুলিও কিন্তু হালাল অর্থনীতির প্রসার করতে গিয়ে বিশ্বজুড়ে প্রতিযোগিতায় প্রথিতযশা কোম্পানি উৎপাদিত বস্তুর উপর চড়া কর আদায়ের মাধ্যমে হালাল শংসাপত্র স্বীকৃতি দেওয়া হয়। ■

ভারত কর্তৃক প্রাচীন চীনের সংক্রমণ নিবারণ বনাম আধুনিক চীনের অনাবশ্যক ভারত আক্রমণ

ভারতের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি চীনদেশে প্রয়োগের কথা স্বীকৃত আছে। ভারতের গৌতম সিদ্ধান্ত, জীবকের নাড়িবিজ্ঞান, অক্ষি ও অস্ত্র বিষয়ক চিকিৎসাশাস্ত্র, প্রশ্নোত্তরে ৬৪টি রোগ ইত্যাদি বহু গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায় চীনের রাজকীয় গ্রন্থাগারে।

ডাঃ আর এন দাস

ভারতের সঙ্গে আড়াই হাজার বছরের সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ককে জলাঞ্জলি দিয়ে ১৯৪৯ সালে চেয়ারম্যান মাও জে দং-এর তথাকথিত সমাজবাদের প্রেরণায় ১৯৬২ সালে বিস্তারবাদী কমিউনিস্ট চীন আকস্মিক আক্রমণে স্থলপথের সিল্করুটের গুরুত্বপূর্ণ লাদাখ ও কারাকোরামের ৪৩ হাজার বর্গকিমি দখল করে নেয়। আগ্রাসী চীন গালোয়ান (২০২০), ডোকলাম (২০১৭) ও অরুণাচলও (২০০৬) বলপূর্বক অধিকার করতে চায়। কিন্তু প্রাচীন চীনের ইতিহাস স্বীকার করে ভারতের মুনিঋষিদের অবদান। চীনে মহামারী ও সংক্রমণ নিবারণ, চীনা ভাষায় আয়ুর্বেদের অনুবাদ, গরুড়-তত্ত্ব, চিকিৎসাশাস্ত্রে সুগন্ধি ওষুধের প্রয়োগ, স্থানীয় ভেষজ ওষুধের উন্নতি সাধন, ফিউমিগেশন পদ্ধতি, বিভিন্ন ব্যাধির কারণ নির্ণয় ও ব্যবস্থাবিধানে ভারতের অবদানের কথা চীনের ইতিহাসে বিস্তৃতভাবে উল্লেখিত হয়েছে।

সারা বিশ্বকে আতঙ্কিত করা করোনা মহামারী ইদানীংকালের সবচেয়ে মারাত্মক মারণরোগ। পৃথিবীব্যাপী ২৬ মিলিয়ন সংক্রমিত লোকের মধ্যে এঐখন পর্যন্ত ৮ লক্ষ মারা গেছেন। চীনের উহান শহরের মাংসবাজার থেকে ২০১৯-এর নভেম্বরে এই সংক্রমণ পরিযায়ী শ্রমিক, ছাত্র ও গবেষকের মাধ্যমে সমগ্র বিশ্বে দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ে। সারাবিশ্বের বিজ্ঞানীরা

করোনা প্রতিরোধের জন্য রকমারি ওষুধ ও ভ্যাকসিনের খোঁজে ব্যস্ত। ডাক্তার, নার্স, হাসপাতাল ও বেড, পরীক্ষার কিট ও ভেন্টিলেটারের আকাল পড়েছে। সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ভরাডুবিতে পৃথিবীব্যাপী লোক আজ 'ত্রাহি মাম; রক্ষ মাম' বলে অদৃশ্য শত্রুর বিনাশের জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানাচ্ছে।

বিজ্ঞানীদের ধারণা, অত্যধিক লোভের বশবর্তী মানুষ কর্তৃক পরিবেশ দূষণ, পারিপার্শ্বিক বাতাবরণের আমূল পরিবর্তন, মহাকাশের ওজোন স্তরের অতিক্রমণ, অরণ্যাঞ্চলগুলি অবৈধ ও বলপূর্বক ধ্বংসসাধন, নির্বিবাদে বন্যপশু হত্যা ও গবাদি পশুহত্যার কারণে পানীয় জল ও শুদ্ধ বায়ুর অভাব ঘটেছে। মাংসাশী মানুষ রসনার তৃপ্তির জন্য মরিশাসের ডোডো পাখির মতো অসংখ্য প্রজাতিকে বিলোপ করেছে। চীনারা কাক, কুকুর, ইঁদুর, বাদর ও বাদুড় খায়। নেপালি হিন্দুরা বিশেষ দিনে কাক ও কুকুরের পূজা করে। হিন্দুদের আরাধ্য দেবতা শ্রীরাম বনের বানরকে এবং শ্রীকৃষ্ণ গোমাতাকে দেবত্ব দান করে অমর করেছেন। হিন্দু দেবদেবীর বাহন হচ্ছে বিভিন্ন পশুপক্ষী। পাশ্চাত্য হেডোনিজমের ভোগবাদীরা ও দেশীয় বিশ্বাসী চার্বাকবাদীদের প্রকৃতি শোষণে প্রাণীকুলের অস্তিত্ব আজ সংকটময়।

১৯৯৮ সালে লোকসভায় অটলজীবিহারী সরকারের গোহত্যা নিরোধক বিলের প্রস্তাবনার বিরোধিতা করে সংখ্যালঘু ভোটভিখারি হিন্দুনামধারী এর মহিলা সাংসদ বলেন, গোমাংস খাওয়ার মৌলিক অধিকার হনন সংবিধানের পরিপন্থী। মার্কসের 'বস্তুতান্ত্রিক সমাজবাদে' বলা হয়েছে, শ্রেণীবৈষম্য দূরীভূত হলে, নিরীশ্বরবাদী মানুষ নিজস্বার্থে প্রকৃতির সঙ্গে লড়াইয়ে শামিল হবে। বৈদিক ঋষিরা বলেছেন, প্রকৃতির শোষণ নয়, তার সংরক্ষণের মহান দায়িত্ব মানুষকেই নিতে হবে। আধুনিক বিজ্ঞানের চরম সীমায় পৌঁছেও পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানীরা প্রাচ্যের দর্শন ও ভাবধারার অনুসন্ধান করছেন। আমেরিকার আবিষ্কারক নিকোলা টেসলা ১৮৯৬ সালে স্বামীজীর মুখে 'প্রাণ ও আকাশ তত্ত্ব' শুনে বৈদান্তিক চিন্তাধারায় প্রভাবিত হয়েছিলেন।

সংবাদমাধ্যম জানাচ্ছে, করোনা মহামারী নিয়ন্ত্রণে চীনারাও আজ হিন্দুদের মতো হোমযজ্ঞ করছে। ভোপালে ১৯৮৪ সালের ইউনিয়ন কার্বাইডের বিষবাষ্পের

মহামারীতে স্থানীকদের হোমযজ্ঞের ধোঁয়া বিশেষ ফলদায়ী হয়েছিল। বিজ্ঞান ও আধ্যাত্মিকতার বিরোধের মধ্যেও বিজ্ঞানীরা প্রাচ্যের পুঁথিপুরাণে, পূর্বপুরুষদের সংগৃহীত জ্ঞানভাণ্ডার থেকে দৈনন্দিন জীবনশৈলীর অন্তর্ভুক্ত ভেষজ সম্পদের নিখুঁত বর্ণনা, পরিবেশ ও বনাঞ্চল সংরক্ষণ, পশুপক্ষীর আশ্রয়স্থলের আয়োজন, পুষ্করণী, নদী-নালার সংস্কার এবং লতাগুল্মাদি-সহ বৃক্ষরোপণের প্রয়োজনীয়তার খোঁজ করেছেন। স্বামী রামদেবের আদর্শে উদ্বুদ্ধ প্রধানমন্ত্রী ২১ জুন বিশ্ব যোগ দিবসের উদ্বোধন করেছেন। সারাবিশ্বের ১৯৫টি দেশ খ্রিস্টপূর্ব ৫০০ বছরের পতঞ্জলি যোগসূত্রের নির্দেশিত অনুলোম-বিলোম, ওঙ্কার ধ্বনির অভ্যাস করছেন। চীন থেকে হাঁটাপথে ফা হিয়েন (খ্রিস্টপূর্ব ৩৩৭-৪২২) ভারতে এসে বৌদ্ধভিক্ষু হন। ফিরে গিয়ে বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে ভারতীয় জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রচার করেন। চীনের শাওলিন কংফু যে ভারতেরই দান, ক্যারাটে বিশেষজ্ঞরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছেন। খ্রিস্টপূর্ব ৫০০ থেকেই চৈনিক পরিব্রাজক ও ভারতীয় বৌদ্ধভিক্ষুরা দু'দেশের ভাবের আদানপ্রদানের প্রধান সাক্ষী ছিলেন। ভারতীয় আচার্যরা চীনা শিষ্যদের জ্যোতিষ, জ্যোতির্বিদ্যা ভেষজ ও ভোজবিদ্যার মহামারী, বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড়তুফানের নিবারণ, বিভিন্ন রোগের নিদান ও উপাচার এবং ভেষজ ওষুধের শিক্ষা প্রদান করেন।

সে যুগে মেধাশক্তির পেটেন্ট-ব্যবস্থা ছিল না। থাকলে হয়তো সবকটা নোবেল ভারতের ঋষিবিজ্ঞানীরাই পেতেন। স্বামীজী বলেছিলেন, যখন প্রাচ্যের মনীষীরা জ্ঞানের সর্বোচ্চ শিখরে বিরাজমান, পাশ্চাত্যবাসীরা তখন 'এপের' পর্যায়ে ছিল। পুরাকালে ভারতীয় বৌদ্ধভিক্ষুরা অহিংসা, করুণা, প্রীতি, ধ্যানজ্ঞানের চর্চা, সমতা, সাম্য, গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা, রাজকীয় গুণাবলী, সংগীতশিল্প, ভাস্কর্য, পূজার্চনা পদ্ধতি, হোমযজ্ঞ, মন্দির ও উপাসনাস্থল, রোগ নিবারণ, নির্ণয় ও নিদানশাস্ত্রের অধ্যয়ন ও গবেষণা চীনাদের শেখান।

চীনা ইতিহাসকার যাং হুয়ার (২৩২-৩০০ খ্রিস্টাব্দে)-এর লেখা 'কলেকসন অব ইনফরমেশনস অব থিংস অব দ্য ইউনিভার্স' থেকে জানা যায়, খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে হান বংশীয় সপ্তম সম্রাট উ ওরফে টোং-কে দিব্যশক্তি সম্পন্ন ভারতীয় সন্ন্যাসী ডিম্বাকৃতি সুগন্ধি সামগ্রী উপহার দেন। সম্রাটের তাতে মন ভরে না। কয়েক দিনের মধ্যেই 'ছাং আন' শহরে মহামারীর প্রাদুর্ভাব হয়। আচার্যের উপদেশানুসারে সেই সুগন্ধিতে অগ্নি প্রজ্বলিত করে ধূপের ধোঁয়ায় মহামারী আক্রান্ত শহরবাসীর নিরাময় হয়। তিন মাস ব্যাপী সেই ধোঁয়া ৫০ কিমি পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। আনন্দিত সম্রাট অমূল্য উপঢৌকনে তাঁকে সম্মানিত করেন। চীনা ইতিহাস (১২৯৬ খ্রিস্টাব্দ) 'জেনারেল রেকর্ডস অব বুদ্ধিস্ট প্যাট্রিয়ার্কস্' থেকে জানা জানা যায়, খ্রিস্টপূর্ব ২৮৭-তে উত্তরচীনের লো ইয়াংগ শহরের মহামারী হলে হরি-বিক্রম বা হালা-হারাকা নামক বৌদ্ধভিক্ষু বৈদিকমন্ত্র ও সুগন্ধিত ধূপধোঁয়ায় চীনাদের নিরাময় করেন। মহামারীতে আক্রান্ত রাজধানী ছাং আন-এর সহস্রাধিক চীনাও সুগন্ধিত ওষুধের ধোঁয়ায় রোগমুক্ত হয়। ওই গ্রন্থে চীনদেশে বৌদ্ধভিক্ষুদের জীবনধারণ ও পূজাপাঠ পদ্ধতি, কার্যকলাপ ও শিক্ষাপ্রদানের কথা উল্লেখিত হয়েছে। শি হুই জিয়াও-এর 'বায়োগ্রাফি অব এমিনেন্ট মংকস'-এ লিপিবদ্ধ আছে ২৫৭ জন ভারতীয় ও চীনা সন্ন্যাসীর কথা, যাঁরা চীনে বৌদ্ধধর্মের প্রচার, সংস্কৃতে লেখা পাণ্ডুলিপির চীনা ভাষায় অনুবাদ এবং চীনে ভারতীয় শিক্ষার প্রসার ঘটিয়েছিলেন। রাজা বিম্বিসারের ও ভগবান বুদ্ধের অন্যতম চিকিৎসক জীবক খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে সমুদ্রপথে চীনের রাজধানী লো ইয়াংগ-এ পৌঁছন। তিনি চীনের হেং ইয়াং প্রদেশের চলৎশক্তিহীন রাজ্যপাল তেন ইয়ং জেনকে'দুরারোগ্য পক্ষাঘাতব্যাধি থেকে মুক্ত করেন। মোহিনী বা ইন্দ্রজালবিদ্যা ভারত থেকেই চীন দেশে যায়। সেই গ্রন্থে, ছেঁড়া কাপড় ও কাটা জিহ্বাকে জোড়া লাগানো, মুখের মধ্যে আগুনের ফুলকি, ধারালো ছুরিকে গিলে ফেলা ইত্যাদি জাদুবিদ্যা উল্লেখিত আছে। হাজার বছর আগে আতসবাজি, বাজিপটকা বা বারুদের ব্যবহার চীনারা ভারতীয়দের কাছেই শেখে।

একাধারে জ্যোতির্বিদ, জ্যোতিষী ও ঐন্দ্রজালিক ভারতীয় চিকিৎসক বুদ্ধচিঙ্গাও ৩১০ খ্রিস্টাব্দে চীনের রাজধানী লো ইয়াংগ'-এ পৌঁছন। কাশ্মীরের বৌদ্ধভিক্ষুরা তাঁর শিক্ষাগুরু ছিলেন। অসীম মেধাসম্পন্ন বুদ্ধচিঙ্গা প্রাচীন পুঁথিপুরাণের ১০ লক্ষাধিক শব্দের শ্লোক কণ্ঠস্থ করেছিলেন। তিনিই চীনসম্রাট শি লে'কে যুদ্ধে বিজয়ী করেন। সৈন্যবাহিনীতে মহামারীর প্রাদুর্ভাব হলে দিব্য ওষুধ ও মন্ত্রশক্তির দ্বারা রোগ নিরাময় করেন। চীনবাসীরা অভিভূত হয়ে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন। পুরস্কারস্বরূপ সম্রাট তাঁকে রাজগুরুর পদে অভিষিক্ত করে সম্রাটের পাশের উচ্চাসনে বসান। পরবর্তী সম্রাটেরাও অত্যন্ত সম্মানের সঙ্গে চীনদেশে বৌদ্ধধর্ম প্রচারে তাঁকে সাহায্য করেন। প্রবল প্রভাবে তিনি উত্তরচীনে ৮৯৩টি বৌদ্ধমন্দিরের স্থাপনা করেন। চৈনিক ইতিহাসকাররা তাঁকে 'শেংশেং' বা দৈবীশক্তি সম্পন্ন সন্ন্যাসী বলে সম্মানিত করেছেন। তাঁর চীনা শিষ্যরা বহু শতাব্দী ধরে চীনে বৌদ্ধধর্ম প্রচার চালিয়ে যান।

খ্রিস্টপূর্ব ৯৮-এ ভারতের কুষাণ রাজবংশের বৌদ্ধভিক্ষুরা চীনের হান সম্রাটদের দরবারে দিব্য সুগন্ধিত ধূপের ধোঁয়ায় মহামারী আক্রান্তদের রোগ নিরাময় করেন। কথিত আছে, ছাং আন-এ মহামারীতে মৃত তিনজনের জীবন ফিরিয়ে দেন ওই বৌদ্ধভিক্ষুরা। চীনা ভাষায় সুগন্ধিত চন্দনকে ঝানটান বলা হয়। চীনের রন্ধনশালায় ধনেপাতা ও হলুদের ব্যবহার ভারতীয়রাই প্রচলন করে। চীনারা হলুদকে বলে ইউঝিন ঝিয়াং, যার অর্থ সুগন্ধিত হলদে সোনা। সেজন্য চীনা বৌদ্ধরা গৌতমবুদ্ধের ভারতকে সগন্ধিত দেশ বলেই জানতো। নেপালের কোনো অস্তিত্ব ছিল না সেকালে। অনাদিকাল থেকে জনকপুর ও বিরাটনগর ভারতেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল। বৌদ্ধমন্দিরগুলিতে সুগন্ধিত ধূপের ধোঁয়া থেকেই ফিউমিগেশনের ধারণা জন্মায়। তাই

হবনক্রিয়া দেখে চীনারা বৌদ্ধ মন্দিরগুলিকে সুগন্ধিত অগ্নিগৃহ, সন্ন্যাসীদের মঠকে সুরভিত অগ্নিসজ্ঞ এবং ভক্তের অর্থসাহায্যকে সুরভিত দান বলত। অতীতে চীনারা প্রজ্বলিত ধূপধুনা এবং নিয়মিত হবনরুপী ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপকে সমৃদ্ধির লক্ষণ বলে জানতো। পুরাকালে চীনারা নির্দ্বিধায় হিন্দু বৌদ্ধের সভ্যতা-সংস্কৃতির বিভিন্ন অনুষ্ঠানকে স্বীয় সমাজে দৈনন্দিন জীবনশৈলীর অন্তর্ভুক্ত করেছিল।

আচার্য ধর্মরক্ষা চীনা ভাষায় মানবদেহের ৪০৪টি রোগের বিস্তৃত বর্ণনা করে চিকিৎসা বিষয়ক গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর লেখা 'ক্লাসিক পাথ টু কালটিভেশন' আধুনিক কৃষিবিজ্ঞানীদের গোপালন ও জৈবিকসারের উপযোগিতার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। তিনি মানবদেহের রোগের কারণতত্ত্বের বিষয়ে মনোগ্রাহী গ্রন্থ রচনা করেন। সমসাময়িক সম্রাট ইউ-এর বিশেষ অনুগ্রহ প্রাপ্ত হন তিনি। দুরারোগ্য ব্যাধির নিরাময় করার অত্যাশ্চার্য ক্ষমতার জন্যই ভারতীয় শিক্ষক ও সন্ন্যাসীরা রাজদরবারে বিশেষভাবে সম্মানিত হতেন। বিখ্যাত চীনা চিকিৎসক ওয়াং তাও (৬৭০-৭৫৫ খ্রিস্টাব্দ) লিখেছেন, 'ইম্পর্টান্ট সিক্রেট প্রেসক্রিপশন' যা ভারতীয় ভেষজেরই অনুকরণে লিখিত। সুই ও তাং রাজবংশের সময়ে বহু ভারতীয় বৌদ্ধভিক্ষু চীনদেশে আয়ুর্বেদের প্রচার করেন। চরক-সুশ্রুতের অনুগামী অনেক বৈদ্য চীনে শল্যচিকিৎসার প্রবর্তন করেন। চীনারা সুতীক্ষ্ণ সূচের সাহায্যে ছানি কাটার পদ্ধতি হিন্দুদের কাছ থেকেই শিখেছিল। ট্যাং রাজবংশের সমসাময়িক বিখ্যাত চীনা দার্শনিক কবি লিউ ইউক্সি তাঁর ছানি কাটায় সন্তুষ্ট হয়ে কৃতজ্ঞতার নিদানস্বরূপ হিন্দু চিকিৎসকের ভূয়সী প্রশংসা করে কবিতা লেখেন। জানি না, আজকের স্বৈরাচারী শাসক শি জিনপিং সেকথা মনে রেখেছেন কিনা!

পঞ্চম শতাব্দীতে সমুদ্রগুপ্তের সময়ে উত্তরপশ্চিম চীনের কুছ অঞ্চলে পাওয়া বার্চপাতার উপর ব্রাহ্মী লিপিতে লেখা সংস্কৃত পাণ্ডুলিপির খণ্ডাংশ মাটির গভীরে প্রোথিত ছিল। তাকেই 'বোয়ার ম্যানুস্ক্রিপ্ট' বলা হয়। রুডফ হোরনলে কলকাতার সরকারি ছাপাখানায় ১৮৯৭ সালে তা প্রকাশ করেন। চীনের ঝিন ঝিয়াং প্রদেশের রাজকীয় গ্রন্থাগারে সেটি আজও সযত্নে রক্ষিত আছে। তার সাহায্যেই সে সময়ে স্থলপথের 'সিল্ক রুটের' মাধ্যমে প্রাচ্য থেকে প্রতীচ্যের মধ্যে সামাজিক, ধর্মীয়, আর্থ-বাণিজ্যিক, রাজনৈতিক ও সামরিক আদানপ্রদানের ইতিহাসের রূপরেখা টানা সম্ভব হয়েছে। চিকিৎসাবিজ্ঞান, পাশা খেলা (চীনা ঃ পাশাক কেভালি) এবং সর্পাঘাতের মৃত্যুঞ্জয়ী মন্ত্রচিকিৎসা (মহাময়ুরি বিদ্যারগৈঃ) চীনারা হিন্দুদের কাছেই শেখে। জীবক-পুস্তক এবং সিদ্ধ-সারের মতোই বোয়ারের পাণ্ডুলিপিও অতীতকালের চীনা চিকিৎসাবিজ্ঞান অনুসন্ধানে এক অমূল্য সম্পদ। জ্যোতিষ শাস্ত্র, জ্যোতির্বিদ্যা (২০ খণ্ড), চিকিৎসাবিজ্ঞান (১০ খণ্ড) ভারত থেকে তিব্বত হয়ে চীনের সুই রাজবংশের হাতে পৌঁছায়। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য নাগার্জুনের রোগনিরাময়ের বিধান (৪ খণ্ড), বিভিন্ন পুস্তক বা পাণ্ডুলিপির তালিকা সংগ্রহ আছে বিশাল এক ক্যাটালগে। বিস্ময়কর ভাবে আজও চীনের রাজকীয় গ্রন্থাগারে সযত্নে রক্ষিত হয়েছে ভারতীয় চিকিৎসাবিজ্ঞানে প্রযুক্ত রোগনিরাময়ের নিদান তালিকা। চীনের চিকিৎসাবিজ্ঞানে ও রন্ধনশালায় সুরভিত ভেষজের প্রয়োগ ভারতীয়রাই চীনাদের শেখায়। দুর্গন্ধ দূর ও বাতাসকে শুদ্ধ করা, রোগনিবারণে, গৃহাঙ্গানের পবিত্রতা রক্ষায়, পূর্জাপার্বণে ও চিকিৎসাশাস্ত্রে সুগন্ধিত উদ্ভিদের ব্যবহার যেমন লবঙ্গ, এলাচ, হরতুকি, হিং, দারুচিনি, মিষ্টি গঁদের আঠা, ধনেপাতা, তুলসী ও কেশরের ব্যবহার চীনারা ভারতীয় আচার্যদের কাছে শিখেছিল। কৃতজ্ঞতাবশত তাঁদেরকে গুরু বা দেবতার স্থানেও বসিয়েছিল চীনারা।

ইতসিয়াং নামের এক চীনা তীর্থযাত্রীর বর্ণনায় কাশ্মীরের বিখ্যাত অশ্বপ্রজনন, পদ্মের আরক থেকে চোখ ও কানের চিকিৎসা, উল্কাপাত নিবারণ এবং ভেষজ উদ্ভিদের উপযোগিতার কথা উল্লেখিত রয়েছে। চীনারা ভারতীয়দের মতোই প্রাকৃতিক দুর্যোগ, রাজার অনুগ্রহ, যুদ্ধে জয় এবং রোগমুক্তির উদ্দেশ্যে বিষ্ণুর বাহন 'গরুড় তত্ত্বের' পূজা করতো। বৌদ্ধ সাহিত্যে আর্য-মঞ্জশ্রী-মুলাকল্পে গরুড় তত্ত্বের বর্ণনা আছে। চীনা অনুবাদ সেখান থেকেই হয়। দশম শতাব্দীর আচার্য ধর্মভদ্র ছাড়াও অনেক ধর্মগুরুর কথা ইতসিয়াং উল্লেখ করেছেন। মিং রাজবংশের সময় থেকেই গরুড় তত্ত্ব চীনাদের জনজীবনে প্রভাব বিস্তার করে। বেজিং-এ প্রাচীন ইয়ংগের রাজকীয় মন্দিরে গরুড়ের রঙিন চিত্রের সন্ধান পাওয়া যায়।

সুই রাজবংশের বর্ষপঞ্জী থেকে জানা যায়, ৭১৯ খ্রিস্টাব্দে কপিলাবস্তু থেকে আগত রাজদূত সম্রাট প্রথম ঝুয়াং ঝাংকে বোধিসত্ত্ব, জ্যোতির্বিজ্ঞানে ও আয়ুর্বেদের উপর লিখিত নাগার্জুনের চিকিৎসানিদান গ্রন্থটি উপহার দেন। প্রাচীন চীনের প্রসিদ্ধ বৈদ্য ওয়াং তাও ৭৫২ খ্রিস্টাব্দে চোখ, নাক ও কান-সহ সমস্ত ভারতীয় নিদানশাস্ত্রের নিখুঁত সংকলন করেন। এমনকী সাদা চুলকে কালো করার কথাও লেখা আছে। চীনের সুন রাজবংশের সঙ্গে ভারতের চোল রাজবংশের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। ভারতের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি চীনদেশে প্রয়োগের কথা স্বীকৃত হয়েছে। ভারতের গৌতম সিদ্ধান্ত, জীবকের নাড়িবিজ্ঞান, অক্ষি ও অস্ত্র বিষয়ক চিকিৎসাশাস্ত্র, প্রশ্নোত্তরে ৬৪টি রোগ ইত্যাদি বহু গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায় চীনের রাজকীয় গ্রন্থাগারে। ■

মতামত

বর্তমানের পরিপ্রেক্ষিতে ভবিষ্যৎ ভারতের সম্ভাব্য রূপরেখা

যুদ্ধের চাপে এবং অভ্যন্তরীণ ক্ষোভের বিস্ফোরণ চীনের বর্তমান রাষ্ট্রব্যবস্থা শেষ পর্যন্ত ভেঙে পড়তে পারে। সেই রাষ্ট্রীয় দুর্বলতার সুযোগে অ-হান অঞ্চলগুলি যথা, অন্তর্মোঙ্গলিয়া, সিংকিয়াং এবং বিশেষত তিব্বত চৈনিক রাষ্ট্র হতে বেরিয়ে যেতে পারে।

দূরদর্শী

ভারতের সুদীর্ঘ হিমালয় সীমান্তে চৈনিক উপদ্রব এখন প্রায় নিয়মিত ব্যাপার হয়ে উঠেছে। মাত্র কিছুদিন হলো চীন গালওয়ান উপত্যকা হতে সরে যাওয়ায় পরিস্থিতি এখন শান্ত। কিন্তু এটা মনে করলে খুবই ভুল হবে যে চীন তার বদমতলব ত্যাগ করেছে। আমরা অনেকেই জানি যে, বর্তমান পৃথিবীতে চীনই হলো একমাত্র দেশ যেটি কেবল আজও টিকে থাকা একমাত্র ভু-সাম্রাজ্যবাদী দেশই নয়, উপরন্তু পৃথিবীর ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন ভু-সাম্রাজ্যগুলির অন্যতম। এই সাম্রাজ্যটির কেন্দ্রীয় অংশ ও চরিত্র হলো হান চৈনিকরা যাদের ভাষা হলো ম্যান্ডারিন। এদের মূল বাসভূমি বর্তমান চীনের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ। বাকি দুই-তৃতীয়াংশ হাজার বছরেরও বেশি সময় ধরে হানদের অসীম ভূমি ক্ষুধার শিকার হয়ে হান সাম্রাজ্যের অঙ্গীভূত হয়েছে—যেমন, মাঞ্চু অধ্যুষিত মাঞ্চুরিয়া, মোঙ্গলদের বাসভূমি অন্তর্মোঙ্গলিয়া, উইঘুরদের দেশ সিংকিয়াং (বা ঝিন্‌জিয়াং) ও তিব্বতীয়দের দেশ তিব্বত। চীনের এই আগ্রাসী ভূমিক্ষুধা এতই প্রবল যে উনিশ শতকে প্রবল পশ্চিমি সাম্রাজ্যবাদের আক্রমণে চীন যখন খুবই শক্তিহীন তখনও ১৮৯০-এর দশকে সিংকিয়াঙের দক্ষিণ সীমা হিসেবে চীনাদের দ্বারাই স্বীকৃত কুয়েনলুং পর্বতমালাকে ব্রিটিশদের প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতে অতিক্রম করে চৈনিকরা কিরঘিজ ইত্যাদি স্বাধীন তুর্কি জাতি অধ্যুষিত একটি বড়ো ভূভাগ দখল করে আরও দক্ষিণে কারাকোরাম পর্বতমালা পর্যন্ত এগিয়ে আসে। ব্রিটিশদের ইঙ্গিতের কারণ ছিল ওই শক্তিশূন্য স্থানটি যাতে রাশিয়া দখল করে ভারত সীমান্তের কাছে না এসে যায়। এই দুর্দমনীয় বিস্তার যে কিছুতেই মেটবার নয় তার প্রমাণ তথাকথিত কমিউনিস্ট চীনও ছিল যখন ১৯৫০ সালে তিব্বতকে 'মুক্ত' করার ভণ্ড অছিলায় রক্তাক্ত অভিযানে নিরীহ তিব্বতকে চীন দখল করার অনতিপরে ১৯৬২ সালে জওহরলাল নেহরুর মেরুদণ্ডহীনতার সুযোগে ভারতের লাদাখ অঞ্চলের ৩০ হাজার বর্গমাইলের অধিক আকসাই চীন দখল করল। কিন্তু চীনের সাম্রাজ্যবাদী প্রসারের ক্ষুধা নিবৃত্ত হবার নয়। তারপর শুরু হলো নিরন্তর হিমালয় সীমান্তে সিকিম, ভুটান, অরুণাচল ইত্যাদি অঞ্চলে অনুপ্রবেশের চেষ্টা। একই সময়ে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় প্রতিবেশী দেশসমূহে যথা, মায়ানমার, ভিয়েতনাম ইত্যাদির ওপরেও চাপ সৃষ্টি হতে লাগল। এর পেছনে কাজ করছিল চীনের একটি গূঢ় লালিত ধারণা যা প্রতিফলিত হয়েছিল মাওবাদী চীনের প্রকাশিত একটি মানচিত্রে। এই মানচিত্রে দেখানো হয় এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চল যা নাকি একদা চীনের প্রভাবাধীন ছিল কিন্তু পশ্চিমি সাম্রাজ্যবাদের চাপে সেসব অঞ্চল চীনের প্রভাবমুক্ত হয়ে যায়, অর্থাৎ মাওবাদী চীনের গূঢ় উদ্দেশ্য ছিল সেইসব অঞ্চল আবার দখল করা। এই মানচিত্র অনুযায়ী পূর্বভারতেরও কিছু অংশ এমনকী পশ্চিমবঙ্গের কিছু অংশ দেখানো হয়।

সুতরাং ভরতীয় সেনার হাতে প্রচণ্ড মার

খেয়ে ও বিরূপ বিশ্বজনমতের চাপে আজ চীন গালওয়ান থেকে সরে গেলেও ভবিষ্যতে চীন আবার ভারত সীমান্তে হামলা চালাবে, এটা ধরে নেওয়া যায় যতদিন চীন তিব্বত অধিকার করে থাকবে।

এ পর্যন্ত আমরা অতীত ইতিহাস আলোচনা করলাম। এবার এই পরিপ্রেক্ষিতে ভারত ভবিষ্যতে কী ধরনের অবস্থার মুখে পড়তে পারে তাই অনুমান করতে হবে। বর্তমান লেখকের মতে ভবিষ্যতে একটি বড়ো আকারের চীন-ভারত যুদ্ধ এড়ানো সম্ভব হবে না একগুঁয়ে সম্প্রসারণশীল চীনের নীতির জন্য। এই যুদ্ধে দুই দেশের বিপুলভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে নিশ্চিতভাবে। ভারতবর্ষের পূর্বাংশের ওপর এই যুদ্ধ বিশেষভাবে বিধ্বংসী হবে। কারণ উত্তরে নাথু-লা হতে চীনারা দক্ষিণে ভারতের অতি দুর্বল স্থান Chicken's Neck-এ আবার চেষ্টা করবে যাতে সমগ্র পূর্বভারতকে বাকি ভরত হতে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া যায়। দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরে চৈনিক নৌবাহিনী পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণাঞ্চল আক্রমণ করতে পারে। কিন্তু ভারতের পক্ষে এই ভয়ানক বিপদ ব্যতীত আরও দুটি সম্ভাব্য ঘটনা ঘটতে পারে যা সারা বিশ্বে আলোড়ন ফেলবে। প্রথমত, এই যুদ্ধের চাপে এবং অভ্যন্তরীণ ক্ষোভের বিস্ফোরণ চীনের বর্তমান রাষ্ট্রব্যবস্থা শেষ পর্যন্ত ভেঙে পড়তে পারে। সেই রাষ্ট্রীয় দুর্বলতার সুযোগে অ-হান অঞ্চলগুলি যথা, অন্তমোঙ্গলিয়া, সিংকিয়াং এবং বিশেষত তিব্বত চৈনিক রাষ্ট্র হতে বেরিয়ে যেতে পারে। তিব্বত পুনরায় স্বাধীন হলে ভারতের হিমালয় সীমান্ত অনবরত চৈনিক বিপদ হতে মুক্তি পাবে। দ্বিতীয়ত, এই ভীষণ যুদ্ধের ফলে চীনের সমস্ত পাপকার্যের দোসর পাকিস্তান লুপ্ত হবে। সিন্ধু ও বালুচিস্তান অবশ্যই পাকিস্তানের হাত থেকে বেরিয়ে যাবে। পাঠানরাও বিদ্রোহ করতে পারে। শেষ পর্যন্ত স্বতন্ত্র অস্তিত্ব হবে না। পাকিস্তানের এই ভগ্নাংশগুলির শেষ পরিণতি কী হবে সেটা অনেকটাই নির্ভর করবে ভারতের নিজস্ব শক্তি ও কূটনীতির ওপর। এরা হয়তো কিছুকাল স্বাধীন অস্তিত্ব বজায় রাখার চেষ্টা করবে। কিন্তু উত্থানশীল, শক্তিশালী ভারতের চুম্বকীয় আকর্ষণ এবং অতীত ইতিহাসকে হয়তো দীর্ঘকাল উপেক্ষা করতে না পেরে শেষ পর্যন্ত ভারতের সঙ্গে যোগ দিতে আগ্রহী হবে।

এবং ঠিক এখানেই আমরা বর্তমান প্রসঙ্গের তৃতীয় পর্যায়ে এসে যাচ্ছি। আমরা জানি এই অঞ্চলগুলিই মুসলমান প্রধান অঞ্চল। এরা যদি ভারতের সঙ্গে যোগ দেয় তাহলে ভারতে হিন্দুরা অবশ্যই সংখ্যালঘু এবং মুসলমানরা সংখ্যাগুরু হয়ে যাবে। ফলে ভারত দারুল ইসলামে পরিণত হবে। সম্ভবত, এই সম্ভাবনার চিন্তাতেই মূলত খিলাফতি হয়েও মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ভারত বিভাজনের বিরোধী হয়েছিলেন। কিন্তু ভারত দারুল ইসলামে পরিণত হলে তার যে সনাতনী চরিত্র আবহমানকাল সংখ্যাগুরু হিন্দুদের মাধ্যমে রক্ষিত হয়েছে তা ধ্বংস হয়ে যাবে এবং ভারত আর মূলত ভারত থাকবে না। ভবিষ্যতের এই সম্ভাবনা এড়াতে হলে ভারতের বর্তমান বহুছিদ্রযুক্ত সংবিধানকে এমনভাবে সংশোধন করতে হবে যাতে ভারতের চিরকালীন সনাতন সুরটি বজায় থাকে, ভবিষ্যতে যত ঐতিহাসিক পরিবর্তনই হোক না কেন। এই মূল হিন্দু সুরটি নষ্ট হলে ভারতের আত্মিক মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী এবং সেক্ষেত্রে স্বামী বিবেকানন্দের মতে মানবজাতির মহৎ গুণগুলির মৃত্যু হবে এবং তখন পৃথিবীতে রাজত্ব করবে কাম, লোভ ইত্যাদি অপগুণগুলি। শ্রী অরবিন্দ বলেছিলেন, ভারতে যে উত্থিত হচ্ছে তা প্রতিবেশীর কণ্ঠ পদপিষ্ট করার জন্য নয়, পরন্তু তার কাছে যে অলোক রক্ষিত আছে তা সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে দেবার জন্য। সেজন্য ভারতের সনাতন হিন্দু রূপটিকে সযত্নে রক্ষা করতে হবে সমস্ত বাহ্যিক পরিবর্তনের আঘাত হতে। ∎

With Best Compliments From :-

EAST INDIA TRANSPORT AGENCY

(A Unit of E.I.T.A. India Limited)

20B, Abdul Hamid Street, 4th Foor

Kolkata - 700 069

Phone : Nos. 22483203

Fax No. 22483195

Email : eita.cal@eitain.com

বিশেষ নিবন্ধ

কমিউনিস্ট চীনের স্বরূপ ধীরে ধীরে উন্মোচিত হচ্ছে

চীন গরিব দেশগুলোকে ঋণের জালে জর্জরিত করে এমনকী ঋণগ্রস্ত দেশের ভূমি পর্যন্ত নিয়ে নিচ্ছে। শ্রীলঙ্কার হাম্বান টোটা বন্দর ৯৯ বছর লিজে দখল নেওয়া তারই উদাহরণ। এভাবে আফ্রিকান দেশ জিবুতিতে গড়ে তুলেছে সামরিক ঘাঁটি। সম্প্রতি শ্রীলঙ্কার নতুন সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী প্রকাশ্যেই বলেছেন হাম্বান টোটা বন্দর চীনের কাছে ইজারা দেওয়া ছিল একটি ভুল সিদ্ধান্ত'।

ঢাকা থেকে বিশেষ প্রতিনিধি।। ইলেকট্রনিক্স সরঞ্জামের ক্ষেত্রে গোটা দক্ষিণ এশিয়ার বাজার চীনা পণ্যের দখলে। তবে দু'দেশের সীমান্তে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ার পর চীনা পণ্য বর্জনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে ভারত। বাংলাদেশ এখন পর্যন্ত চীনা পণ্যের একচেটিয়া বাজার। এর আগে জাপন, মালয়েশিয়া ও দক্ষিণ কোরিয়ার পণ্যের ওপর নির্ভরশীল ছিল বাংলাদেশ। গত এক দশকে তা এখন চীনের দখলে। এর প্রধান কারণ দেখতে একই রকম পণ্য তারা অনেক সাশ্রয়ী মূল্যে বিক্রি করে। এতে ক্রেতার চেয়ে অবশ্য ব্যবসায়ীরা অনেক বেশি লাভবান হচ্ছেন। একই পণ্য কম দামে তারা চীন থেকে তৈরি করিয়ে এনে বিরাট মুনাফা করছেন। তবে এতদিন ক্রেতা সাধারণ একটা জিনিস বুঝে গেছে— চীনা পণ্য মানেই স্বল্প স্থায়ী বা ঠুনকো। এটা শুধু ইলেকট্রনিক্স সরঞ্জামের বেলায় প্রযোজ্য নয়, অস্ত্র ও গোলা বারুদের বেলায়ও সমানভাবে প্রযোজ্য। এমনকী গন্তব্যে পৌঁছবার আগেই তা বিকল হওয়ার নজির আছে। আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে এই বিষয়গুলো প্রকাশিত হয়েছে।

২০০১ সাল পর্যন্ত চীন বাংলাদেশে একচেটিয়া ছিল না। এই বছরের ১ অক্টোবরের সাধারণ নির্বাচনে বিএনপি-জামায়াত জোট নির্বাচনে জয়লাভ এবং ১০ অক্টোবর সরকার গঠন করে। এরপরই চীনের বরাত খুলে যায়। খালেদা জিয়ার সরকার চীনের সঙ্গে সম্পর্ক মজবুত করতে সময় নেয়নি। দীর্ঘ পাঁচ বছর ক্ষমতায় থাকাকালে তারা দেশের সশস্ত্র বাহিনীর সরঞ্জামের জন্য চীনের সঙ্গে বেশ কয়েকটি চুক্তি সই করে। পরবর্তীতে এসব চুক্তির ধারাবাহিকতা আওয়ামি লিগ সরকারকে বজায় রাখতে হয়। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকালে চীন পাকিস্তানের পক্ষ নেওয়ায় তাদের ব্যাপারে মুক্তিযুদ্ধ নেতৃত্বদানকারী আওয়ামি লিগের নেতিবাচক মনোভাব ছিল। কিন্তু পূর্ববর্তী সরকারের বোঝা টানতে গিয়ে চীনের সঙ্গে আওয়ামি লিগ সরকারের সম্পর্ক নতুন করে তৈরি হয়। ক্রমে নানা কারণে এই সম্পর্ক গাঢ় হয়ে ওঠে। পরবর্তীতে নিজেরাও চীনের কাছ থেকে দুটি সাবমেরিন ও একাধিক যুদ্ধজাহাজ ক্রয় করে। এক্ষেত্রে ক্রয়ের চেয়ে ক্রয় করতে বাধ্য হয় বলা ভালো। কারণ ইতিমধ্যে মিয়ানমার চীনের কাছ থেকে দুটি সাবমেরিন ও অন্যান্য যুদ্ধাস্ত্র লাভ করে। একে হুমকি হিসেবে দেখে বাংলাদেশ। এ ব্যাপারে আপত্তি জানালে চীন বাংলাদেশের কাছেও সাবমেরিন বিক্রির প্রস্তাব দেয়। একপ্রকার বাধ্য হয়ে বাংলাদেশ ওই প্রস্তাব গ্রহণ করে। আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে আরও বলা হয়, চীনের ব্যাপারে আওয়ামি লিগ সরকারের গোড়ার দিকে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব সম্পর্কে তারা ওয়াকিবহাল ছিল। কিন্তু সংযুক্ত সীমান্ত না থাকায় প্রচণ্ড আগ্রাসী দেশটি বাংলাদেশের ওপর সরাসরি চাপও সৃষ্টি করতে পারে না। তবে তাদের এ সমস্যার সমাধান করে দিয়েছে দু'দেশের সীমান্তবর্তী দেশ মিয়ানমার। চীন এখন মিয়ানমারকে ব্যবহার করে বাংলাদেশকে কাবু রাখার চেষ্টা করছে বলে গুঞ্জন রয়েছে। এ কারণে ধারণা করা হয় মিয়ানমার থেকে রোহিঙ্গা বিতাড়নের পরিকল্পনা তৈরি হয়েছিল যৌথভাবে। তাছাড়া যে অঞ্চল থেকে রোহিঙ্গাদের উৎখাত করা হয়েছে তার কাছাকাছি এলাকায় চীন দূর সমুদ্র বন্দর তৈরি করছে।

বাস্তবে চীনের অস্ত্র বা সরঞ্জাম কোনো সমস্যা নয়। সমস্যা হচ্ছে গুণগত মান। একে তো চীন বাংলাদেশের কাছে বহুল ব্যবহৃত যুদ্ধ সরঞ্জামও বিক্রি করছে। অপরদিকে কোনো কোনো অস্ত্র নাকি চালু করার আগেই বিগড়ে যাচ্ছে। এরপরও চীন তাদের পণ্য ক্রয়ের জন্য নানারকম লোভনীয় শর্তের পাশাপাশি জুজুর ভয় দেখাচ্ছে। শুধু পুরনো নয়, চীনের তৈরি নতুন সরঞ্জাম নিয়েও প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। বিশেষ করে চীনা নৌবাহিনীর সর্বাধুনিক যুদ্ধজাহাজে কোনো কারণ ছাড়া ভয়াবহ আগুন লেগে যাওয়ার পর থেকে সন্দেহের তির শাণিত হচ্ছে।

২০২০ সালের ১১ এপ্রিল সকালে, সাংহাই ডকইয়ার্ডে পিএলএ নেভির এলএইচডি-তে আগুন লাগে। প্রথমে রিয়ার হ্যাঙ্গার খোলার পরে ধোঁয়া বেরিয়ে আসতে দেখা যায় এবং দ্বীপের সুপার স্ট্রাকচারের কাছ দিয়ে তা উপরে উঠতে থাকে। এরপর আগুন নিভে গেলেও শিপইয়ার্ড কর্তৃপক্ষ ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ সম্পর্কে কিছু বলেনি। দশ দিনের মধ্যে ক্ষতিগ্রস্ত

জাহাজটির সুপার স্ট্রাকচারের কালো চিহ্নগুলি মুছে ফেলা হয় এবং গত ২২ এপ্রিল পিএলএ নেভির নতুন মডেলের যুদ্ধ জাহাজের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানেরকজন্য তা পুরোপুরি প্রস্তুত করা হয়। তবে ধোঁয়ার তীব্রতা একটি বড়ো অগ্নিকাণ্ডের ইঙ্গিত দেয় যা উল্লেখযোগ্য ক্ষতিসাধন করে থাকতে পারে। অগ্নি নির্বাপিত হওয়ার পর চীনা শিপইয়ার্ডগুলির উপাদান, কারিগরি গুণগতমান, শিল্প সুরক্ষা রীতি এবং আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের প্রতি তাদের আনুগত্য নিয়ে প্রশ্নগুলি পুনরায় জাগ্রত হয়েছে। তবে উল্লেখ্য, নব্বইয়ের দশকে একপ্রকার খালি হাতে শুরু করে চীনের আজ শীর্ষস্থানীয় শিল্প নির্মাতা হওয়ার পিছনে দেশটির জাহাজ নির্মাণ শিল্পের ব্যাপক অবদান রয়েছে। জাহাজ নির্মাণ শিল্পটি বেসামরিক অর্থনীতি এবং চীনের প্রতিরক্ষা শিল্প কমপ্লেক্সের মধ্যে যোগসূত্র গড়ে তুলেছে। জাহাজ নির্মাণের ক্ষেত্রে চীন আজ বিশ্ববাজারে আধিপত্য বিস্তার করেছে। চীনের শিপইয়ার্ডগুলো দ্রুততর সময়ে যুদ্ধ ও বাণিজ্যিক উভয় জাহাজ বিনির্মাণের যোগ্যতা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। এ ব্যাপারে বেশ কয়েক বছর ধরে, বিশ্বব্যাপী বিশেষজ্ঞদের মনে বিভিন্ন প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে। যদিও চীনারা তাদের শিপইয়ার্ডের দুর্বল উপাদান এবং কারিগরি অদক্ষতার অভিযোগ জোরালোভাবে প্রত্যাখান করেছে। তারা আন্তর্জাতিক মান লঙ্ঘনের অভিযোগও কঠোরভাবে খণ্ডন করে। তবে অতি অল্প সময়ে তাদের এই অর্জন সম্পর্কে সন্দেহ (বিশেষত যুদ্ধজাহাজের নকশা ও নির্মাণের মতো জটিল ক্ষেত্রে) যায়নি। একাধিক সংস্থা দেশীয়ভাবে নির্মিত পিএলএ নৌবাহিনীর জাহাজগুলির নির্মাণ ও যুদ্ধ দক্ষতা বিশ্লেষণ করার জন্য নানারকম প্রচেষ্টা চালিয়েছে। তবে চীনে সরকারি, সামরিক, শিল্প জটিল কাজগুলি অস্বচ্ছভাবে করায় সঠিক মূল্যায়ন করা যায় না। এ কারণে চীনা শিপইয়ার্ডগুলোতে আন্তর্জাতিক গ্রাহকদের জন্য যে যুদ্ধজাহাজ তৈরি করা হচ্ছে তার সামর্থ্য যাচাই করা সম্ভব হচ্ছে না। ফলে অনেক ক্ষেত্রে ক্রেতা দেশ ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে।

পাকিস্তান সম্প্রতি চীন থেকে ৮টি ইউয়ান শ্রেণীর সাবমেরিন সংগ্রহের জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়। প্রথম চারটি সাবমেরিন চীনের শিপবিল্ডিং ইন্ডাস্ট্রি কর্পোরেশনের (সিএসওসি) অধীনে নির্মাণ করা হবে। অপর চারটি সাবমেরিন করাচি শিপইয়ার্ড অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস (কেএসএইডব্লিউ)-এ সংযোজন করার কথা। কিন্তু করাচিতে সাবমেরিন সংযোজনের ব্যাপারে আপত্তি তুলেছে জার্মানির এমটিইউ ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানি। কারণ এই কোম্পানির উদ্ভাবিত ডিজেল ইঞ্জিনই চীনের সাবমেরিনে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। ২০০২ সালে জার্মানির এমটিইউ-র সঙ্গে চীনের নরিনকো কোম্পানি সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী চীন কেবল অভ্যন্তরীণ ব্যবহারের জন্য এই মডেলের ইঞ্জিন ব্যবহার করতে পারবে। তাই জার্মানি পাকিস্তানের কাছে এই ইঞ্জিন বিক্রির ব্যাপারে আপত্তি জানাচ্ছে। কেননা তা চুক্তি লঙ্ঘনের শামিল। বিপদ বুঝে পাকিস্তান এখন জার্মানিকে তাদের ৮টি সাবমেরিনের ইঞ্জিন রপ্তানির ওপর বিধিনিষেধ শিথিল করার অনুরোধ জানাচ্ছে।

চীন ও পাকিস্তান উভয়ই তাদের মধ্যে ইস্পাত-কঠিন বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের দাবি করে। তবে এই সম্পর্ক যে মোটেই স্বার্থবিহীন নয়, চীনা নির্মিত এফ ২২ পি ফ্রিগেটগুলির পুনর্নির্মাণের অনুরোধ জানানোর সময় সেটা পরিষ্কার হয়। এই জাহাজগুলি বিভিন্ন প্রযুক্তিগত ত্রুটিযুক্ত। এই সমস্যা কাটিয়ে ওঠার জন্য পাকিস্তান নৌবাহিনী ২০১৮ সালের সেপ্টেম্বরে জাহাজগুলির মিড-লাইফ আপগ্রেড বা পুনর্নির্মাণের জন্য চীনের সিএসটিএস-কে অনুরোধ করে। কোনো লাভ না থাকায় তারা এ ব্যাপারে আগ্রহ দেখায়নি। ফলে পাকিস্তান তুরস্কের সাহায্য নিতে বাধ্য হয়। ২০১৯ সালের জুনে চীন শ্রীলঙ্কার নৌবাহিনীকে (এসএলএন) একটি যুদ্ধ জাহাজ উপহার দেয়। ২,৩০০ টনের প্রথম শ্রেণীর ডিকমিনেশনড ফ্রিগেটটি শ্রীলঙ্কার কাছে হস্তান্তর করার আগে এর মিসাইল এবং সিআইইডব্লিউএস সিস্টেমটি খুলে নেওয়া হয়েছিল। ২০১৮ সালের ২৫ জুন জাহাজটি (এলএলএনএস পরাক্রমবাহু) সাংহাই থেকে যাত্রা করে। তবে এত বড়ো ধরনের অপারেশনাল ত্রুটি থাকায় এটি বন্দর দিয়ে প্রবেশের আগে জরুরি মেরামতের কাজ শুরু করতে হয়েছিল।

২০০৯ থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত চীন বাংলাদেশের সবচেয়ে বড়ো অস্ত্র সরবরাহকারী দেশ ছিল, এই সময়ে বাংলাদেশের আমদানি করা মোট অস্ত্রের ৮২ শতাংশ ছিল চীন থেকে সংগ্রহ করা। স্টকহোম আন্তর্জাতিক শান্তি গবেষণা ইনস্টিটিউট (এসআইপিআরআই) জানায়, চীন ৩৫টি দেশে অস্ত্র রপ্তানি করেছে এবং এর মধ্যে বাংলাদেশ দ্বিতীয় বৃহত্তম আমদানিকারক। চীন দীর্ঘদিন ধরেই বাংলাদেশের প্রধান অস্ত্র সরবরাহকারী। তাদের বেশিরভাগ অস্ত্র সশস্ত্র বাহিনী ব্যবহার করে। এর পাশাপাশি কিছু যুদ্ধবিমানও চীন থেকে কেনা হয়। চীন থেকে অস্ত্র কেনার মূল দুটি কারণ হচ্ছে ‘লাভজনক ঋণ’ ব্যবস্থা এবং সাশ্রয়ী মূল্য।

জানা যায়, উদার ঋণ ব্যবস্থা এবং প্রতিযোগিতামূলক মূল্য ছাড়ের কারণে গত এক দশকে চীন বাংলাদেশ নৌবাহিনীর প্রধান অস্ত্রদাতায় পরিণত হয়েছে। বাংলাদেশ নৌবাহিনীতে চীন থেকে রেয়াতি মূল্যে কেনা দুটি ০৩৫ জি মিং ক্লাস সাবমেরিন (বিএনএস নবজাত্রা এবং বিএনএস জয়যাত্রা) অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যার প্রতিটি ১০০ মিলিয়ন ডলারে বিক্রি করা হয়েছিল। ২০০৩ সালের এপ্রিল পিএলএ নেভি মিং ক্লাস সাবমেরিন ৩৬১ পীত সাগরে যান্ত্রিক গোলযোগে পড়ে বলে জানা যায়। এছাড়া বাংলাদেশ নৌবাহিনী (বিএন) চীন থেকে ২০টিরও বেশি যুদ্ধ জাহাজ সংগ্রহ করেছে। এর কয়েকটিতেও ত্রুটি ধরা পড়েছে।

বাংলাদেশ নৌবাহিনী সম্প্রতি শেনজিয়া শিপইয়ার্ড থেকে দুটি চীনা যুদ্ধ জাহাজের (বিএনএস উমর ফারুক এবং বিএনএস আবু উবাইদাহ) ডেলিভারি নিয়েছে। উভয় জাহাজ একাধিক ত্রুটি নিয়ে ২০২০ সালে মংলা বন্দরে পৌঁছায়। সমুদ্রে পরীক্ষার সময় জাহাজ দুটির নেভিগেশন রাডারে ত্রুটি ধরা পড়ে। এসব র‌্যাডার প্রয়োজনীয় উপাদান সনাক্ত করতে সক্ষম নয়। এসব কারণে চীনে তৈরি পণ্য দিন দিন বিতর্কিত হচ্ছে।

কোভিড-১৯ পরবর্তী সময়ে অনেক ক্লায়েন্ট দেশ চীন সফর বাতিল এবং তাদের দেশে চীনা নাগরিকদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করেছে। যথাসময়ে উৎপাদন এখন চীনের জন্য দুঃস্বপ্ন। উহানের উচাং শিপইয়ার্ডের কাছাকাছি মিলিটারি ডিজাইন ইনস্টিটিউটের অবস্থান হওয়ায় নৌ প্রকল্পগুলি সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বাস্তবায়নের আওতাধীন প্রকল্পগুলির ক্ষেত্রে কেবল মালয়েশিয়া ও বাংলাদেশ নৌবাহিনীর জন্য রপ্তানি প্রকল্পে আনুমানিক ৮০০ মিলিয়ন ডলার লোকসান হয়েছে। কোভিড-১৯-এর কারণে থাইল্যান্ড চীন থেকে ২২ বিলিয়ন ডলারের ইউয়ান ক্লাসের (টাইপ ০৪১) দুটি সাবমেরিন কেনার পরিকল্পনা বাতিল করেছে। সাম্প্রতিক একটি সিএসআইসি প্রতিবেদনে বলা হয়, জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়ার সঙ্গে চীনের নতুন আন্তর্জাতিক শিপিং চুক্তি বাতিলেরও সম্ভাবনা রয়েছে। অবশ্যই ধোঁয়াশা কেটে গেলে একটি পরিষ্কার চিত্র ফুটে উঠবে। কিন্তু ততদিন চীনের ভাবমূর্তি ও বিশ্বাসযোগ্যতা আরও মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে নিশ্চিতভাবেই তা বলা যায়। *(ক্রমশ)*

অতিথি কলম

কৃষ্ণমূর্তি সুব্রমণিয়ন

করোনা প্রাদুর্ভাবই জিডিপি পতনের কারণ

আনলক পর্ব শুরুর সঙ্গেই তা তুমুল বেগে ঘুরে দাঁড়াচ্ছে

ভারত-সহ বিশ্বের সমস্ত দেশই অর্থনীতিতে অর্থ জোগান, ধার বা গ্রাহকের খাতায় সরাসরি প্রয়োজনীয় ক্রয়-ক্ষমতা বৃদ্ধির রসদ সরবরাহ করেছে যাতে সামগ্রিক চাহিদায় বৃদ্ধি ঘটে। এরই প্রত্যক্ষ প্রতিক্রিয়া হিসেবে অর্থনীতির পুনরুত্থান ঘটছে।

এপ্রিল থেকে জুন এই ত্রৈমাসিকে (প্রথম ত্রৈমাসিক) জিডিপি-র পতনের কারণ করোনা মহামারী। অর্থনীতিতে মহাপতনের মতো কোনো মহামারী নয়। প্রাপ্ত পরিসংখ্যানগুলি এই সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করছে। একই সঙ্গে আনলকের সূচনাপর্ব থেকেই তার ঊর্ধ্বগতিও পরিলক্ষিত হচ্ছে।

কিছু কিছু বিশ্লেষকের একেবারে প্রাথমিক ভ্রান্ত ধারণা যে ২০২০ অর্থবর্ষের জুন ত্রৈমাসিকের জিডিপি-র ফলাফল বিগত ১২ মাসের ফলাফল থেকে সম্পূর্ণ মুছে গেছে। জিডিপি যেহেতু একটি প্রবহমান প্রক্রিয়া তাই এই তিন মাসের ফলাফল থেকে এটুকুই শুধু বোঝা যেতে পারে যে এই সময় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের গতিপ্রকৃতি কেমন ছিল। জিডিপিতে ঘটা পরিবর্তনগুলিকে সব সময় বিগত বছরের সেই নির্দিষ্ট ত্রৈমাসিকের সঙ্গে তুলনা করা হয়। এর কারণ যাতে অর্থনীতির সমানুপাতিক সময় প্রতিফলিত হয়। সেই কারণে নীতিগতভাবে এটা ধরে নেওয়া নিতান্তই ভুল বা ভুল বোঝাবুঝি হবে যে জিডিপি থেকে একটি ত্রৈমাসিক সম্পূর্ণ মুছে গেছে। সঠিক নির্ণয় এটাই হবে এপ্রিল-জুন ২০১৯-এর থেকে ২০২০-র এপ্রিল-জুনের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ২৩.৯ শতাংশ কম হয়েছিল।

মনে রাখতে হবে, বিগত মার্চ মাস থেকে ভারতে বিশ্বের অন্যতম তীব্র 'লকডাউন' চালু হয়েছিল। এর প্রয়োজন অনিবার্য ছিল, একারণেই যে গভীর ঘনবসতিপূর্ণ অঞ্চলে যে কোনো মহামারী সবচেয়ে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। সবচেয়ে বেশি লোককে সংক্রমিত করে। অত্যন্ত আঁটোসাঁটো লকডাউন না থাকলে শুরুর মার্চ মাস থেকেই এই মহামারী জঙ্গলে লাগা আগুনের মতো ছড়িয়ে পড়তে পারত। যার পরিণতিতে দেশে সাম্ভাব্য ভবিষ্যৎ রোগীদের জন্য স্বাস্থ্য পরিষেবা তৈরি করারও কোনো সুযোগই কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলির হাতে থাকত না। আজ দেশব্যাপী যে বিশাল সংখ্যক রোগ পরীক্ষা চলছে তা আদৌ সম্ভব হতো না। একটি প্রত্যক্ষ উদাহরণ দিয়ে বলা যায় যে মার্চ-এপ্রিল মাস নাগাদ করোনায় মৃত্যুর যে হার ছিল তা যদি দৈনিক সংক্রমণের ৯০ হাজারের সমানুপাতে বিচার হতো (যা এখন দেখা গেছে) আর তার মোকাবিলায় উপযুক্ত স্বাস্থ্য পরিকাঠামো না থাকায় দৈনিক মৃত্যুহার পৌঁছত তিন থেকে চার হাজারে। নেমে আসত গণশোকের মর্মান্তিক আবহ।

হ্যাঁ, এটা নিশ্চিত ভারতের জিডিপি-তে ২৩.৯ শতাংশ যে ঘাটা হয়েছে তার কারণ মহামারীর কারণে জারি হওয়া লকডাউন। স্পেন ও ইংল্যান্ডের লকডাউনের ফলে প্রথম ত্রৈমাসিকে অর্থনীতিতে যে লোকসান হয়েছিল অর্থাৎ যে নেগেটিভ বৃদ্ধি হয়েছিল তা পণ্ডিতদের অনুমিত পরিমাণের চেয়েও বেশি। সেখানেও লকডাউন তীব্র হলেও লোকে তা লঘু করে নিয়েছিল। অন্যদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রাজিল যারা অর্থনীতির গতিকে থমকে দেওয়ার বিপক্ষে থেকে লকডাউনের গুরুত্বকে খাটো করে দেখা এই উভয় দেশকেই কঠিন মূল্য চোকাতে হয়েছে। দুটি দেশেই মৃত্যুর সংখ্যা সর্বাধিক। গাণিতিক সংখ্যার হিসেবে ভারতের মৃত্যু কম না হলেও প্রতি লক্ষে মৃত্যুর হার হিসেবে ভারতের সংখ্যা অনেক কম। এই পরিসংখ্যানের পেছনে সক্রিয় ছিল ভারতের মানবিক অর্থনৈতিক পরিকল্পনা। যার সারাংশ ছিল জিডিপি-র বৃদ্ধি পুনরুদ্ধার করবার অবকাশ পাওয়া যাবে যার প্রমাণ আমরা পেতে শুরু করেছি। হায়! যে

সরকার অবশ্যই এই বিশাল সমস্যার মোকাবিলায় দায়বদ্ধ, কিন্তু বর্ণিত সরল পাটিগণিতটিও মাথায় রাখতে হবে। মহামারীর আঘাতেই অর্থনীতি পর্যদুস্ত। অর্থনীতি কোনো মহামারীর মতো বিপর্যয় ডেকে আনেনি।

জীবনগুলি আমরা হারিয়েছি তাদের তো আর ফিরে পাওয়া যাবে না।

এই সিদ্ধান্তে স্বপক্ষে প্রমাণ হিসেবে চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি মাসের কথা বলা যায়। যখন অর্থনীতিতে বৃদ্ধির রুপালি রেখা নজরে আসছিল। এই সময়ই এল করোনার ধাক্কা। 'গুগুল' চলমানতার যে সূচক তৈরি করে তা অনুযায়ী মহামারীর প্রকোপ ভারতে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে মার্চ মাস থেকে অবরুদ্ধ করতে থাকে। জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারির তুলনায় মার্চ মাসে অগ্রগতি ২০ শতাংশ কমে যায়। পরিষেবা ক্ষেত্র (হোটেল, রেস্তোরা, বিমান, রেল) যা ভারতের বৃদ্ধির অন্যতম প্রধান চালিকা শক্তি— সামাজিক দূরত্ব নিয়ন্ত্রণ ও লকডাউন বলবৎ হওয়ায় তা মার খেতে শুরু করে।

একথা সন্দেহাতীতভাবে বলা যায় কেননা এর পিছনে নিরেট পরিসংখ্যান রয়েছে যে ফেব্রুয়ারি মাস থেকে অর্থনীতি ঝিমুনি কাটিয়ে এগিয়ে যাওয়ার দিশা খুঁজে পাচ্ছিল। প্রথম জিডিপি-তে অন্তর্ভুক্ত হয় এমন সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ সূচকের ক্ষেত্রেই ইতিবাচক বৃদ্ধি শুরু হয়েছিল। জুলাই ২০১৯-এর সাত মাস পরে ফেব্রুয়ারিতে ঘুরে দাঁড়ানো ছিল অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

দ্বিতীয়ত, শুধু ফেব্রুয়ারি নয় এই সূচকগুলি যেমন উৎপাদন, খনিজ, তেল উত্তোলন, নির্মাণ প্রভৃতি ক্ষেত্রগুলিতে অক্টোবর ২০১৯ থেকেই কম-বেশি বৃদ্ধি সূচিত হতে থাকে।

তৃতীয়ত, অর্থনীতি ক্ষেত্রে purchasing manager index (PMI) বলে আন্তর্জাতিক গ্রাহ্য যে মানদণ্ড রয়েছে যা ভবিষ্যৎ অর্থনীতির গতিমুখ সম্পর্কে ইঙ্গিত দেয় সেখানে পরিষেবা ক্ষেত্রে নজরকাড়া বৃদ্ধির ভবিষ্যৎ অনুমান প্রত্যাশা মতো মিলে গিয়ে ফেব্রুয়ারিতে বিপুল বৃদ্ধি ঘটায়। লকডাউন আসার পরই মার্চে তা হুড়মুড় করে ৫০ শতাংশ নেমে আসে। মহামারীর এই আক্রমণ না থাকলে মার্চ ২০২০'র শেষ ত্রৈমাসিক অর্থাৎ চতুর্থভাগে বৃদ্ধি ৩.১ শতাংশ অনায়াসে ছুঁয়ে ফেলত। মহামারীর প্রাদুর্ভাবের আগে এই ধরনের বৃদ্ধির আভাস এটাই প্রমাণ করে যে ২০১৯-এর জুলাই

ভারতের মতো অর্থনীতি যেখানে জিডিপি-র বৃদ্ধি ভোগ্যপণ্যের বাজার ও বিনিয়োগের ওপর ৯০ শতাংশ ও সরকারি ব্যয়ের ওপর ১০ শতাংশ নির্ভরশীল সেখানে ক্রয়ের ও বিনিয়োগের ১ শতাংশ কমে গেলে সরকারের তরফে ৮ থেকে ৯ শতাংশ খরচ বাড়াতে হবে। তবেই জিডিপি-র মাত্রা ঠিক রাখা যাবে।

মাসে কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে অর্থনীতি ক্ষেত্রে যে উন্নয়নমূলক সিদ্ধান্তগুলি নেওয়া হয়েছিল তা প্রত্যাশা মতো ফলদায়ী হতে শুরু করেছিল।

অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে এটা লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, জিডিপি বৃদ্ধির উচ্চ মাত্রার সূচকগুলিকে বৃদ্ধি ঘটিয়ে অর্থনীতি চলতি আনলক পর্বে তেজিয়ানভাবে যাত্রা শুরু করেছে। এই ইতিবাচক পরিবর্তনগুলি অর্থনীতির পরিভাষায় রেখাচিত্রের প্রতিফলনের মাধ্যমে বিশেষজ্ঞরা দেখিয়েছেন। উদাহরণস্বরূপ আগে বলা পিএমআই ম্যানুফ্যাক্টচারিং, আটটি core ক্ষেত্র, e-way bill, বিদ্যুৎ উৎপাদন ও খরচ, রেল পরিষেবায় মাশুল আদায়, পণ্য পরিবহণ, যাত্রী গাড়ি বিক্রয়, ট্রাক্টর বিক্রয়, সর্বোপরি খারিফ শস্যের বপনের মাত্রা বিগত বছরের কম সময়ের মাত্রাকে ছুঁতে চলেছে। অর্থনীতির ভাষায় গুরুত্বপূর্ণ V-আকৃতির পুনরুত্থান আনলক পর্বে নেওয়া সরকারের আপৎকালীন নীতিগুলির ফলেই কার্যকরীভাবে এগিয়ে চলেছে।

বিশেষভাবে উল্লেখ করতে গেলে ভারত-সহ মহামারীর কবলে পড়া সমস্ত দেশই মন্দা থেকে পরিত্রাণ পেতে বাজারে নগদের জোগান, ব্যাঙ্কের মাধ্যমে ধার ও সরাসরি বিভিন্ন প্রকল্পের অধীনে ব্যাঙ্ক খাতায় সরাসরি টাকা পাঠানোর মতো (ডিবিটি) কাজ করেছে যাতে দেশের অভ্যন্তরে পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধি পেয়ে বিক্রি বাড়ে, বৃদ্ধি ঘটে উৎপাদনে এবং অর্থনীতির চাকা বেগবান হয়ে পুরনো গতি পায়। বলা দরকার আনলক পর্বে সরকারের নেওয়া পদ্ধতিগুলি সফলতা দেখাচ্ছে।

এ প্রসঙ্গে সকলেই স্বীকার করতে বাধ্য যে, এই মহামারী অর্থনৈতিক বিপর্যের সঙ্গে সঙ্গে একটি অভূতপূর্ব ক্ষতিকারক মানসিক আঘাতও বটে। এই মানসিক হতাশা উপভোক্তার মানসভূমিতে এক ধরনের তীব্র নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। প্রত্যেকটি বিপর্যয়ই ব্যক্তি ও সংস্থার ওপর খরচের পরিবর্তে ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করার প্রবণতা বাড়িয়ে দেয়। কিন্তু অতীতের সমস্ত বিপর্যয়গুলির মূলে সক্রিয় ছিল অর্থনৈতিক কারণ। কিন্তু এবারের এই আপৎকালীন অবস্থার মূলে এমন এক মহামারী যেখানে একে অপরের থেকে দূরে থাকাই আবশ্যিক শর্ত। মানুষের কাছে তার জীবনের নিরাপত্তা সর্বাধিক অগ্রাধিকার পায়। সেই কারণেই না কিনলে নয় দৈনন্দিন জীবনে পরিহার করা যায় এমন বস্তু ছাড়া মানুষ কেনাকাটা থেকে সরে গেছে। ভারতের মতো অর্থনীতি যেখানে জিডিপি-র বৃদ্ধি ভোগ্যপণ্যের বাজার ও বিনিয়োগের ওপর ৯০ শতাংশ ও সরকারি ব্যয়ের ওপর ১০ শতাংশ নির্ভরশীল সেখানে ক্রয়ের ও বিনিয়োগের ১ শতাংশ কমে গেলে সরকারের তরফে ৮ থেকে ৯ শতাংশ খরচ বাড়াতে হবে। তবেই জিডিপি-র মাত্রা ঠিক রাখা যাবে। সরকার অবশ্যই এই বিশাল সমস্যার মোকাবিলায় দায়বদ্ধ কিন্তু বর্ণিত সরল পাটিগণিতটিও মাথায় রাখতে হবে। মহামারীর আঘাতেই অর্থনীতি পর্যদুস্ত। অর্থনীতি কোনো মহামারীর মতো বিপর্যয় ডেকে আনেনি।

(লেখক ভারত সরকারের প্রধান অর্থনৈতিক উপদেষ্টা)

বিশেষ নিবন্ধ

গ্রন্থাগারের মৃত্যু—অতীত ও বর্তমান

কুণাল চট্টোপাধ্যায়

ইখতিয়ার-আল-দিন মহম্মদ বক্তিয়ার খলজি, খুদাবক্স খাঁ বাহাদুর ও সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী এই তিন জনের মধ্যে মিল কোথায় এই প্রশ্ন যদি কাউকে করা যায় তাহলে প্রায় সকলেই বলবেন তিনজনই ইসলাম মতাবলম্বী। কিন্তু যেটা উল্লেখ করার মতো তা হলো এই তিনজনের সঙ্গেই নাম জড়িয়ে আছে সেটি হলো 'গ্রান্থাগার'। ইতিহাসে আমরা পড়ি প্রথমজন দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতকের ক্রান্তিকালে বাঙ্গলা-বিহারের একাধিক গ্রন্থাগার ধ্বংস করেছিল। সেই সময়কার বেশ কিছু মুসলমান ঐতিহাসিকের লেখাতেও তেমনটি জানা যায়। দ্বিতীয়জন ঠিক বিপরীত দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন। এই কালজয়ী সংগ্রাহকটি বিহারের বাঁকিপুরে তাঁর নামাঙ্কিত লাইব্রেরিতে অমর হয়ে আছেন। শেষের জন বর্তমানে আমাদের রাজ্যের গ্রন্থাগার মন্ত্রী।

লাইব্রেরির ইতিহাস খুবই প্রাচীন। মিশরে, প্রাচীন ইতালিতে আসিরীয় সভ্যতার যুগেও লাইব্রেরির সন্ধান মেলে। আলেকজান্ডারের গুরু অ্যারিস্টটলের এক প্রকাণ্ড লাইবেরি ছিল। এথেন্সে ছিল ইউক্লিভের সংগ্রহ। আলেকজান্ডারের সেনাপতি টলেমির মিশর জয়কালে আলেকজান্দ্রিয়ার বিশ্ববিখ্যাত লাইব্রেরিটি গড়ে ওঠে। জুলিয়াস সিজার ভূমধ্যসাগরে নৌবহরে আগুন লাগালে তার প্রভাবে আলেকজান্দ্রিয়ার ওই গ্রন্থাগারটি যারপরনাই ক্ষতি হয়। পরবর্তীকালে অ্যান্টোনিও কিছু মূল্যবান বই রক্ষা করে নাকি ক্লিয়োপেট্রার কাছে রাখেন।

বক্তিয়ার খলজির প্রায় সমসাময়িককালে বাগদাদে বিখ্যাত লাইব্রেরি দ্য হাউস অব উইশডম গড়ে ওঠে। সেই সঙ্গে গড়ে ওঠে আব্বাসিদ পাবলিক অ্যাকাডেমি। ইসলামের দ্রুত বিস্তারের দিনে খালিফা আব্বাসি ও হারুন অল রশিদ এই জ্ঞানপীঠের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ১২৫৮ খ্রিস্টাব্দে এটি মোঙ্গল শাসক হুলাগু খানের হাতে ধ্বংস হয়। ৫ ফেব্রুয়ারি ১৩৫৮-তে এক নিষ্ঠুর আক্রমণে সিরীয় খ্রিস্টান স্কলার ও গ্রিকদের অ্যালকেমির অনুবাদ, পিথাগোরাস, প্লেটো, এমনকী শুশ্রুত, চরক, আর্যভট্ট ব্রহ্মগুপ্তদের সৃষ্টি সেখানে সম্পূর্ণ ধ্বংস করা হয়। সেখানে ৮২৮ খ্রিস্টাব্দে প্রথম জ্যোতির্বিজ্ঞানের মানমন্দিরই কেবল গড়ে ওঠেনি, রাখা ছিল আল খোয়ারিজমির পুস্তক আলজাবার। যাঁকে আরব ভূখণ্ডে বীজগণিতের বাহক ভাবা হয়ে থাকে।

আমাদের দেশে বেদের যুগে গুরুগৃহে অধ্যয়ন শেষে এক একজন ছাত্র এক একটি লাইব্রেরি হয়ে গৃহে প্রত্যাবর্তন করতেন। আলবেরুনি বলেছেন ৯৫০ খ্রিস্টাব্দে কাশ্মীরে প্রথম বেদ কলমবন্দি হয়। বিহারের বিক্রমশিলা, নালন্দা, জগদ্দল ছাড়া আরও পরে বল্লাল সেনেরও নাকি লাইব্রেরি ছিল।

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী লিখেছেন নেপালে মুসলমান আক্রমণ হয়নি। সেখানে নিবারের রাজারা তাঁদের লাইব্রেরিতে বহু প্রাচীন পুঁথি রক্ষা করেছেন। নেপালে বিহার থেকে পলাতক বৌদ্ধ ভিক্ষুরাও বহু মূল্যবান গ্রন্থ নিয়ে যান। এই ঘটনা কনস্টানটিনোপলের পতনের পর গ্রিক পণ্ডিতদের মূল্যবান পুস্তক সম্পদ নিয়ে দেশান্তরী হওয়ার সঙ্গে তুলনীয়।

ঊনবিংশ শতকের আমাদের এই বঙ্গদেশে অনেক ভালো ভালো গ্রন্থাগার গড়ে উঠেছিল। বিদ্যাসাগর, প্যারীচরণ সরকার, রমেশ দত্ত, রাধাকান্ত দেব, আশুতোষ মুখার্জি প্রমুখ স্মরণীয়জনের ব্যক্তিগত বইয়ের বিশাল সংগ্রহ ছিল। এমনকী উত্তরপাড়ার জয়কৃষ্ণ মুখার্জি বা কোচবিহারের নৃপেন্দ্রনারায়ণের সংগ্রহ ছিল বঙ্গদেশের সম্পদ বিশেষ। স্বাধীনতার পর

আধুনিক যুগে সারা রাজ্যে অবলুপ্তির পথে যাওয়া ১০০০ গ্রন্থাগারের প্রায় ৪০ লক্ষ বই নষ্টকারী সেই তুর্কি আক্রমণকারীর প্রতি একধরনের শ্রদ্ধা প্রদর্শন হয়ে থাকবে। সবচেয়ে পরিতাপের বিষয়টি হলো, লাইব্রেরির অবলুপ্তি যখন ঘটেছে তখন এই রাজ্যের গ্রন্থাগার মন্ত্রী দেওবন্দি ইসলামি স্কলারদের যে প্রতিষ্ঠান জামিয়াত উলেমা-এ হিন্দ তার নেতা।

এইসব বিখ্যাত গ্রন্থাগারগুলি কম-বেশি সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছে। এছাড়া জাতীয় গ্রন্থাগার, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, গোলপার্ক রামকৃষ্ণ মিশনের মতো লাইব্রেরিগুলো স্বমহিমায় বিদ্যমান। আমাদের ছাত্রজীবনে বরানগর-সিঁথি সেন্ট্রাল লাইবেরি ছাড়াও ইন্ডিয়ান ইন্সটিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট ছিল এই অঞ্চলেই। আইএসআই-এর লাইব্রেরি ও বিশেষ করে সেখানকার পিসিএম কালেকশান, বিজ্ঞানী সিউয়ার্ট-এর দান করে যাওয়া তাঁর প্রায় সারাজীবনের সংগ্রহ (ইমপিরিয়াল গেজেটিয়ার অন্যতম),

গলব্রেথের দেওয়া সংগ্রহ, এমনকী লন্ডনের ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরি থেকে অধ্যাপকের আনা মাইক্রো ফিল্মগুলি এখানকার সম্পদ বিশেষ। এক সময় এই লাইব্রেরি আলিপুরের জাতীয় গ্রন্থাগারের প্রতিস্পর্ধী ছিল। আপ্লুত বিস্ময়ে তাকিয়ে দেখার মতো সেসব সংগ্রহ। ছাত্রজীবনে কতদিন স্টেট সেন্ট্রাল লাইব্রেরিতে নিঃশব্দে শেফালি কুড়োতে গিয়েছি। পরবর্তীকালে কর্মজীবনে নির্জন রাশভারী আইএসআই লাইব্রেরিতে অনেকগুলো দিন কেটেছে দক্ষতা অর্জনের উদ্দেশে। এখানকার ভবনটিতে জ্ঞানের গুঞ্জন অপেক্ষা ঐশ্বর্যের কোলাহলই যেন বেশি পাওয়া যায়। একদিন এই গ্রন্থাগারে দু' ভলিউমে Hestings Letters to his Wife আমি দেখেছি। মরকতকুঞ্জকেও নিঃস্ব করে রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার চলে গেছে সিআইটি রোডে। আইআইএম-ও এখন জোকায়।

ইতিহাসে গ্রন্থাগার ধ্বংসের যেমন নজির আছে, হারিয়ে যাওয়া গ্রন্থাগারের নতুন করে আবিষ্কারের ঘটনাও কম আগ্রহোদ্দীপক নয়। আমরা জানি ভিসুভিয়াসের আগ্নেয়গিরি পম্পেইয়ের মতো নগরী ধ্বংস করেছিল। কিন্তু এমনই মহাবিধ্বংসী আগ্নেয়গিরি হারকিউলিয়েনের গরম লাভার স্রোত ও ছাই পাথরের নীচে চাপা পড়েছিল একটা গোটা অক্ষত গ্রন্থাগার। ১৭৫০ সাল নাগাদ কুয়ো খুঁড়তে গিয়ে তার অস্তিত্বের কথা জানা যায়। বর্তমান নেপল্‌সের কাছে সেখানে ১৮১৪টি প্যাপিরাস স্ক্রল রাখা আছে, যার মধ্যে ৩৪০টি পুরোপুরি পড়া গেছে।

একইভাবে ইতিহাস সচেতন চীনাদের প্রয়াস আবিষ্কার করে 'লাইব্রেরি কেভ'। জনৈক তাওবাদী চীনা ওয়াংউয়াংলু মোগাও কেভে বালি সরিয়ে পাথরবন্দি অসংখ্য পাণ্ডুলিপি, ছবি প্রভৃতি উদ্ধার করে লাইব্রেরি কেভ থেকে।

এই বিষয়ে কালজয়ী সংগ্রাহক খুদাবক্স খাঁ বাহাদুর আমাদের দেশে বাঁকিপুরে তাঁর নামাঙ্কিত লাইব্রেরিতে অমর হয়ে আছেন। স্যার যদুনাথ সরকার সেটিকে অক্সফোর্ডের বডলিয়ান লাইব্রেরির সঙ্গে তুলনা করেছেন। গ্রন্থসম্পদ কী নেই সেখানে? তুর্কির সুলতান দ্বিতীয় মুহম্মদের কনস্টিনটিনোপল ও অন্যান্য ইউরোপীয় দেশে জয়ের বিবরণ (পৃথিবীতে এর আর দ্বিতীয়টি নেই) শাহজাহানের সই করা দুটি বই, দারাশিকোর সাধুচরিত, আমীর খসরুর 'মসনবী'। এমন অসংখ্য সংগ্রহ। বড়লাট কার্জন খুদাবক্স গ্রন্থাগার দর্শনান্তে জাহাঙ্গিরকে উদ্ধৃত করে বলেছিলেন,

'আগার ফির্দৌস খসরু ও জমীনস্ত
হমিনস্ত, হমিনস্ত, হমিনস্ত'

অর্থাৎ ধরাতলে যদি কোথাও স্বর্গ থাকে, এই সেটা, এই সেটা, এই সেটা।

সম্প্রতি বরানগর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয়ের সম্পাদক মহারাজের অনুরোধে কিছু বলতে গিয়ে ওই লাইব্রেরির জন্ম ও মৃত্যু দু'দিনেই উপস্থিত থাকার কথা বলায় উপস্থিত লোকজনের মধ্যে লক্ষণীয় আগ্রহ দেখা দেয়। ফলে বিষয়টি স্পষ্ট করতে হয়। ১৯৬৩ সালে ওই সরকার পোষিত গ্রন্থাগারটির যেদিন আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়, সেদিন আমি সদ্য প্রাথমিক শিক্ষান্তে মাধ্যমিক শ্রেণীর ছাত্র। বিশাল লাইব্রেরি হলে অন্যান্য অতিথিদের মধ্যে আমি প্রবেশাধিকার না পাওয়ায় একটা অতৃপ্তি সারাজীবন বহন করে চলেছি। তার কারণ হলো ওই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেছিলেন পশ্চিমবঙ্গের দু'বারের শিক্ষামন্ত্রী মুন্সী রায় হরেন্দ্রনাথ চৌধুরী। তাঁর দান করা বহু মূল্যবান বইয়ের সংগ্রহ দিয়েই মূলত এই লাইব্রেরির জন্ম। কেবল বই-ই নয় বরানগর মিশনের জমির এক বিরাট অংশও টাকি ও নড়াইলের একদা জমিদার এই হরেন্দ্রনাথবাবুদের দান করা। পরবর্তীকালে জেনেছিলাম, ১৯৩৫ সালে মুসলিম লিগ সরকারের শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতিবাদে তিনি Our Language Problem, the New Menace to High School Education এই শিরোনামে একটি বই লেখেন। তাই তাঁকে সামনে পেয়েও না দেখাটা কষ্টকর লেগেছিল।

লাইব্রেরিয়ানের অবসরের অনুষ্ঠানটিকে লাইব্রেরির মৃত্যুদিন বলার কারণ, পরদিন থেকেই লাইব্রেরিটির বন্ধ হয়ে যাওয়া। আজ সেই বন্ধ তালায় মরচে পড়েছে। বর্তমানে এই রাজ্যে ২৪০০টি সরকার পোষিত লাইব্রেরির মধ্যে ১০০০টি বন্ধ হয়ে গেছে।

এই রাজ্যের বিভিন্ন ছোটো বড়ো নানা শহরে একদা পিপলস লাইব্রেরিগুলো গড়ে উঠেছিল। সেগুলো শিক্ষার সঙ্গে সজ্জন মানুষজনের মিলন কেন্দ্র ছিল। বিনা পারিশ্রমিকে এদের অনেকগুলোই পরিচালিত হয়েছে একদিন। হয়তো এখনও হয়। বরানগর রামকৃষ্ণ মিশন এরিয়া লাইব্রেরির অকালমৃত্যু আটকানোর জন্য কোনো উদ্যোগই নেওয়া হলো না। এটা অত্যন্ত পরিতাপের। বঙ্গদর্শন থেকে মর্ডান রিভিউয়ের মতো পত্রিকাগুলো একদিন যে গ্রন্থাগারের গৌরব বৃদ্ধি করেছিল, যুগে যুগে যেখানে অনেকে তাঁদের সারা জীবনের সংগ্রহ দান করেছেন, সেই সারস্বত প্রতিষ্ঠানে বিনা পারিশ্রমিকেও শ্রমদান করতে রাজি ছিল এখানকার পাঠকদের কেউ কেউ। বলা হয় বিদ্যাদান সেরা দান, সেখানে কেউ যদি লাইব্রেরি দান করেন, তাহলে তা শ্রেষ্ঠ দানের উপরও যদি কিছু থাকে তাই দান করে থাকেন।

আমাদের এই সমগ্র জীবনের সাক্ষী এই লাইব্রেরিটি এক হাজার প্রয়াত লাইব্রেরির একটি হয়ে গেল, এ লজ্জা ব.খবো কোথায়?

নালন্দা, ওদন্তপুরির গ্রন্থাগারে কয়েক লক্ষ পুস্তকে অগ্নিসংযোগ সংক্রান্ত ক্লিন ইতিহাস আমরা পাঠ করি। সেটা ছিল অন্ধকার মধ্যযুগ। বালুরঘাটের অদূরে গঙ্গারামপুর ব্লকের পীরপাল এলাকায় বখতিয়ার খলজির সমাধির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে আজও ওই এলাকার মানুষ খাট, চৌকি বর্জন করে মাটিতে শোয়। আধুনিক যুগে সারা রাজ্যে অবলুপ্তির পথে যাওয়া ১০০০ গ্রন্থাগারের প্রায় ৪০ লক্ষ বই নষ্টকারী সেই তুর্কি আক্রমণকারীর প্রতি একধরনের শ্রদ্ধা প্রদর্শন হয়ে থাকবে। সবচেয়ে পরিতাপের বিষয়টি হলো, লাইব্রেরির অবলুপ্তি যখন ঘটেছে তখন এই রাজ্যের গ্রন্থাগার মন্ত্রী দেওবন্দি ইসলামি স্কলারদের যে প্রতিষ্ঠান জামিয়াত উলেমা-এ হিন্দ তার নেতা। ■

ভারতীয় শিক্ষার স্বরূপ সংকল্পনা সমূহের স্পষ্টীকরণ

ইন্দুমতী কাটদরে

৯. আধুনিকতা

'আধুনিক' কথাটা শুধুমাত্র কালবাচকই নয়, এটা গুণবাচক শব্দও বটে। 'আধুনিক' হচ্ছে একটা কালখণ্ড আর আধুনিকতা জীবন ও জগতের প্রতি এক ফিরতি দৃষ্টিকোণ। ষোড়শ শতাব্দীর ইতালির লরেন্স ইত্যাদি শহরে পুনর্জাগরণ থেকে আধুনিকতার উৎপত্তি বলে মনে করা হয়। এটা খ্রিস্টধর্মের ও পরম্পরার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া ছিল যা প্রায় বারোশো বছর পর্যন্ত ইউরোপীয় দেশের ওপর নিজের ধর্মীয়, বৈচারিক ও রাজনৈতিক প্রভাব বজায় রেখেছিল। এমনিতে আধুনিক বিচার দৃষ্টির বীজারোপণ চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতাব্দীতেই হয়ে গিয়েছিল। উইলিয়ম অব ওকম, মার্সিলিও অব পেড়ুয়া, ওয়াইক্লিফ প্রমুখ দার্শনিকগণ চার্চে ব্যাপ্ত ভ্রষ্টাচার সংশোধন করবার যে পথ দেখালেন তাতে ব্যক্তিবাদী, বুদ্ধিবাদী, ইহলোকবাদী ইত্যাদির স্বীকৃতিকে পুষ্ট করেছিল। এই স্বীকৃতিগুলোই আধুনিকতার ভিত্তিস্তম্ভ গড়ে দিল। এই দার্শনিকগণ লৌকিক , পারলৌকিকের মধ্যে ভেদ করবার সঙ্গে সঙ্গে লৌকিক বিষয়গুলোতে চার্চের হস্তক্ষেপ এবং ধর্মীয় ও নৈতিক সিদ্ধান্তগুলির অনুশাসনকে অনুচিত বিবেচনা করে এই প্রকার ধর্মসত্তার সর্বোচ্চতা ও ব্যাপকতাকে চ্যালেঞ্জ জানাল।

ষোড়শ শতাব্দীর পুনর্জাগরণ গ্রিক ও রোমান সভ্যতার দোহাই দিয়ে যেভাবে মানবতাবাদকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা হলো তা স্বনিয়ন্ত্রিত মানুষ — একক স্বত্বসম্পন্ন মানুষের প্রতিষ্ঠা ছিল। এই মানবতাবাদের অন্য অভিব্যক্তিগুলি হলো— নামবাদ, ব্যক্তিবাদ, ইহলোকবাদ এবং বৈজ্ঞানিক বুদ্ধিবাদ যারা আধুনিক বিচারধারাকে বৌদ্ধিক পুষ্টি দিয়েছে। প্রোটেস্ট্যান্ড সংস্কার আন্দোলনের জনক মার্টিন লুথার প্রোটেস্ট্যান্ট খ্রিস্টান ধর্মের যে সিদ্ধান্তগুলিকে প্রতিপাদন করলেন তা খ্রিস্টীয় ধর্ম পরম্পরার সামগ্রিকতার দৃষ্টিকে অস্বীকার করে ধর্মের ক্ষেত্রেও ব্যক্তিবাদের প্রতিষ্ঠা করে থাকে। এমনিতে মার্টিন লুথার ও অন্যান্য ধর্ম সংস্কারকদের উদ্দেশ্য চার্চে ব্যাপ্ত নৈতিক অধঃপতনকে দূর করে খ্রিস্টত্বকে পরিশ্রুত করা কিন্তু বাস্তবে এই ধর্ম সংস্কার আন্দোলন খ্রিস্টধর্ম পরম্পরার ওপর কুঠারাঘাত করল এবং ধর্মতত্ত্বকেই তিরস্কার করল। ধর্ম সংস্কার আন্দোলন প্রথমে সংশয় এবং যুগান্তরের অনাস্থাকে বলশালী করল। অতঃপর যে মানবতাবাদের প্রতিপাদন পুনর্জাগরণ যুগের দার্শনিকগণ করেছিলেন সেই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গিকে মার্টিন লুথার আদি সংস্কারকগণ অঙ্গীকার করলেন। এইজন্য পাশ্চাত্য আধুনিক বিদ্বজ্জনেরা আধুনিকতার দুটো ধারা --- পুনর্জাগরণ ও ধর্মসংস্কারকে মান্যতা দিয়ে থাকেন। পুনর্জাগরণ ও ধর্মসংস্কার দুটো ধারাই ধর্মভিত্তিক সভ্যতাকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করবার কাজ করল এবং শেষ পর্যন্ত ভৌতিক ইহলোকবাদী জীবনদর্শনকে প্রতিষ্ঠিত করতে সফল হলো। অষ্টাদশ শতাব্দীর ফ্রান্সের বিশ্বকোষ নামে প্রসিদ্ধ দার্শনিকরা যেমন দিদরো, ভল্টেয়ার, হলবাক প্রমুখ এই চিন্তাধারাকে আরও তীব্র করলেন এবং বললেন যে মানুষ যদি নিজের বুদ্ধিকে ধর্ম ও পরম্পরার অধোগামী প্রভাব থেকে মুক্ত করতে পারে তবে সে অন্তহীন প্রগতির পথকে প্রশস্ত করতে পারে। উনবিংশ শতাব্দীতে ফরাসি দার্শনিক আগস্ত কোঁতে ইন্দ্রিয়জনিত অভিজ্ঞতা তথা তর্ক বুদ্ধি সর্বশ্রেষ্ঠতার ওপর আধারিত প্রগতিবাদী দর্শনের প্রতিপাদন করলেন। তাঁর দাবি ছিল যে ধনাত্মকবাদী বা প্রত্যক্ষবাদী দর্শনে সমগ্র মানবজীবনের পুনর্রচনার সূত্র প্রদান করা হয়েছে তা একটি কালজয়ী আধুনিক সভ্যতার নির্মাণ করবে।

আধুনিকতা মানুষকে স্বয়ংসম্পূর্ণ বলে স্বীকার করে। তদনুসারে ইন্দ্রিয়জাত অনুভব ও বুদ্ধিবলের মিলিত শক্তি দ্বারা সৃষ্টির সব রহস্যের জ্ঞানলাভ করতে সক্ষম এবং মানব ইতিহাস এই অভিমুখেই এগিয়ে চলেছে। আধুনিক বিচারধারা মানুষের সর্বজ্ঞতার প্রতিপাদক হয়ে আছে। আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান এটা বিশ্বাস করে যে মানুষ অভিজ্ঞতা, ব্যবহার এবং তর্কশক্তির বলে প্রকৃতি ও সমাজের সব পক্ষকে প্রকাশিত করতে পারে এবং এই প্রকার অভূতপূর্ব ভৌতিক ও অর্থনৈতিক অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারে। আধুনিক জ্ঞানমীমাংসাতে ঋতম্ভরা, প্রজ্ঞা ও আত্মানুভূতির কোনো স্থান নেই। আধুনিক যুগের তিনটি বিশিষ্ট বিপ্লব এবং ১৭৭৬ সালের মার্কিন বিপ্লব, ১৮৮৯-এর ফরাসি বিপ্লব ও ১৯১৭ সালের বলশেভিক বিপ্লব দ্বারা স্বয়ংসম্পূর্ণ সিদ্ধান্তের আধারে রাজনৈতিক সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থাসমূহের নবজীবন প্রদান করবার প্রয়াস করা হলো। এসব বিপ্লব এমন একটা সেকুলার ইউটোপিয়ার প্রচেষ্টা চালালো যাতে পৃথিবীতেই মানুষ স্বর্গসুখ লাভ করতে পারে এবং পরলোকবাদ অপ্রাসঙ্গিক হয়ে যায়। প্রসিদ্ধ চিন্তাবিদ এরিক বোগলিন নতুন বাস্তবতা গড়বার এই মহাত্বাকাঙ্ক্ষাকে আধুনিকতার উদ্দেশ্য বোঝাতে গিয়ে টিপ্পনী করেছেন যে, পরম্পরাগত সমাজের স্বীকৃতিগুলো হচ্ছে সত্যের প্রতিবিম্ব যখন আধুনিক বিচারধারাতে সত্যকে স্বীকৃতিগুলোর ফসল বলে মনে করে। প্রত্যক্ষবাদী দৃষ্টিকোণ কোনো লোকোত্তর সত্তাকে বা বিধানকে অস্বীকার করল এবং শেষপর্যন্ত আধুনিক বিচারকগণ 'ঈশ্বরের মৃত্যু'র ঘোষণা করলেন। বিংশ শতাব্দীর পরম্পরাবাদী ফরাসি চিন্তাবিদ রেনে গেনো যথার্থই বলেছিলেন যে আধুনিক মানবতাবাদে কোনো আধিভৌতিক, আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক সত্য বা সত্তার জন্য কোনো স্থান থাকতে পারে না। আধুনিক মানুষ নিজেকে বিরাট পুরুষের অংশরূপে দেখে না। সে সত্যের কারিগর হতে চায়। অনুসন্ধান চলতে থাকা তাকে সন্তুষ্ট করে না।

আধুনিক বিচারদৃষ্টি ব্যক্তি, সমাজ ও ব্রহ্মাণ্ডকে যন্ত্ররূপে দেখে থাকে। তাদের মতে ব্যক্তি হচ্ছে কিছু রাসায়নিক ও জৈবিক কর্মকাণ্ড তথা ইচ্ছা, ভাবনা ও তর্কবুদ্ধির মিশ্রিত ফল। সমাজ ব্যক্তির ইচ্ছা ভাবনা ও তাদের দ্বারা গঠিত সংস্থানসমূহের যোগ এবং ব্রহ্মাণ্ড পরমাণু ও তাতে নিহিত শক্তির যোগমাত্র। এই বিচারভঙ্গিতে কোনো সমগ্রতা ও অবয়বসম্পন্ন পারিপার্শ্বিকতার অভাব রয়েছে। এতে এক থেকে অনেক হবার স্বীকৃতির কোনো স্থান নেই। এটা স্বায়ত্ত, অসম্বন্ধ অনেককে একটা কৃত্রিম একতা ও সন্দেহাস্পদ স্থিরতা প্রদান করার প্রয়াস করে থাকে। গ্রিক, রোমান ও খ্রিস্টীয় সভ্যতাগুলো যে ঈশ্বরকেন্দ্রিক ব্রহ্মাণ্ডের স্বীকৃতিকে প্রতিপাদন করল, আধুনিকতা তাকে অস্বীকার করে মানবকেন্দ্রিক ব্রহ্মাণ্ডের ধারণাকে প্রতিপাদন করছে। জ্ঞান ও পুরুষার্থের উচ্চতর সোপানগুলোর প্রতি উপেক্ষা বা অস্বীকৃতির ভাব হচ্ছে তার বৈশিষ্ট্য। সমগ্র জীবনদৃষ্টির অভাবে মানবজীবনের সমস্ত ক্ষেত্র--- সমাজ, রাজনীতি, অর্থব্যবস্থা, কলা, সাহিত্য ইত্যাদি পৃথক হয়ে গেল এবং নিজের নিয়ামক সিদ্ধান্ত নিজেই গড়তে লাগল। এই কারণেই আধুনিক চিন্তাধারায় গভীর বিশৃঙ্খলা দৃষ্টিগোচর হয়ে থাকে। আধুনিক চিন্তাধারা জীবনকে অস্বাভাবিক রূপে জটিল করে দিয়েছে এবং এতে করে উৎপন্ন সমস্যাগুলোকে কৃত্রিম, আপাত ও তৎকালীন সমাধানগুলো থেকে নিষ্পত্তি করার উপক্রম হচ্ছে।

ব্যক্তি স্বয়ংসম্পূর্ণ, পৃথক ও অসংবদ্ধ প্রাণী মনে করবার ফলস্বরূপ সামাজিক সংস্থা ও সম্বন্ধগুলোর পবিত্রতার দৃষ্টিতে নয় বরং উপযোগিতার দৃষ্টিতে দেখা হয়ে থাকে। আধুনিক সমাজশাস্ত্র, রাজশাস্ত্র এবং নীতিশাস্ত্রে ব্যবহারিকতাবাদী, উপযোগিতাবাদী ও পরিণামবাদী নীতিগুলোর যে বন্যা এল তার কারণে ব্যষ্টি ও সমষ্টির মধ্যকার সম্বন্ধ বোঝবার সম্যক দৃষ্টির অভাব রয়েছে। আত্মকেন্দ্রিক ব্যক্তির চিন্তাধারার ওপর আধারিত সমাজব্যবস্থা অধিকার, স্বতন্ত্রতা ও সাম্যের; অর্থব্যবস্থা ভোগ ও লাভ; সাহিত্য, কলা প্রাকৃতজনের স্তুতিগান এবং জ্ঞানবিজ্ঞান ভৌতিক অনুভূতিগুলোর ওপর কেন্দ্রিত হোক এটা স্বাভাবিকই বটে। স্পষ্টত, মানবিক পুরুষার্থ ভৌতিক ও আর্থিক কল্যাণ ও লক্ষ্য

পর্যন্ত সীমিত রাখবার এই উপক্রম হচ্ছে খ্রিস্ট্রীয় উপদেশের নিতান্তই বিরুদ্ধ যাতে তিনি 'মানবজীবন শুধুই রুটির জন্য নয়' বলে ঘোষণা করেছিলেন।

আধুনিক রাজনীতিজ্ঞরা ব্যক্তি ও রাজ্য সম্পর্ককে স্পষ্ট করার জন্য অনেক বিচারধারা গড়েছেন। উদারতাবাদ, সমাজবাদ, আদর্শবাদ, অরাজকতাবাদ ইত্যাদি। আবার প্রত্যেকটির অনেক সংস্করণ দ্বারা রাজনীতির মূল স্বরূপের ব্যাখ্যা করা হয়েছে। কিন্তু রাজশাস্ত্রের এই বিদ্বজ্জনদের মাঝে মূল প্রশ্ন নিয়ে এত মতভেদ রয়েছে, এত বিবাদ রয়েছে যে প্রশ্ন আরও গুলিয়ে যায়। তার জন্য বিচারের স্বাধীনতা ও সাপেক্ষতাকে ঢাল বানিয়ে এই লজ্জা থেকে দৃষ্টি ঘুরিয়ে দেওয়া হয়। চিন্তার গণতান্ত্রিকতা থেকে উদ্ভূত আপেক্ষিকতাবাদের স্বৈরাচার প্রত্যেক প্রশ্ন ও প্রত্যেক উত্তরকে সন্দেহজনক করে দিয়েছে। যে কোনো বিচারধারাকে বিশ্বদৃষ্টি মানা যেতে পারে। ব্যক্তি রাজ্যের সম্বন্ধের কথাই ধরা যাক। কিছু রাজনীতিবিদ একে মূলত বিরোধীভাবাপন্ন মেনে নিয়ে রাজ্যকে আবশ্যক ও অনাবশ্যক অশুভ বলে ঘোষণা করেছেন, আবার কেউ কেউ মহাত্মাকাঙ্ক্ষী ও মহিমামণ্ডিত মনে করেছেন যে ব্যক্তিকে রাজ্যের মধ্যে বিলুপ্তই করে দিয়েছেন। কোথাও রাজ্যকে বিলুপ্তিকরণের পক্ষ, আবার কোথাও ব্যক্তিকে, কোথাও রাজ্যের কর্মক্ষেত্র বিস্তারের পক্ষধর, আবার কোথাও রাজ্যের সংকোচনের পক্ষপোষণ। আধুনিক রাজনীতিকরা রাষ্ট্রীয়তাকেও একটা নতুন সংজ্ঞা প্রদান করলেন। ভাষা অথবা প্রজাতি নির্ভর রাষ্ট্র-রাজ্যের ধারণা সৃষ্টি করা হলো এবং এর ভিত্তিতে পুনর্জাগরণ কালোত্তর ইউরোপের রাজনীতি একটি নতুন স্বরূপ প্রাপ্ত হলো। এই রাষ্ট্র-রাজ্যকে স্বয়ংসম্পূর্ণ ঘোষণা করে আইনকে একমাত্র এবং সর্বোচ্চ মেনে নেওয়া হলো। শুধু রাজ্যই নয় পরিবার, বিয়ে, অর্থনীতি, ভাষা, সংস্কৃতি ইত্যাদির প্রকৃতি তথা উদ্দেশ্যের ব্যাখ্যা সাকারবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে করা হলো।

আধুনিকতার উদয় তো ইউরোপে হলোই কিন্তু ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে তা বিশ্বের কোণায় কোণায় পৌঁছালো। আধুনিক বিজ্ঞানের তীব্র বিকাশের ফলস্বরূপ শিল্পবিপ্লব হলো, সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদনও বৃদ্ধি পেল। নতুন ধনী ইউরোপ নিজের এই ভৌতিক তথা আর্থিক প্রগতিকে আধুনিক চিন্তাধারার শ্রেষ্ঠতা বলে মেনে নিল। এশিয়া, আফ্রিকা তথা ল্যাটিন আমেরিকার পারম্পরিক সংস্কৃতিগুলো কখনও বল দ্বারা আবার কখনও স্বেচ্ছায় এই আধুনিক বিচারভঙ্গীকে অঙ্গীকার করতে লাগল। জীবনদর্শনের এই উপনিবেশীকরণ সর্বব্যাপী হতে থাকল এবং আধুনিকীকরণ সাধারণ তথা সুধীজন, রাজনীতিবিদ তথা অর্থনীতিবিদদের জন্য সর্বোচ্চ মানদণ্ড ও মূল্য হয়ে উঠল। পূর্বাঞ্চলীয় দেশসমূহ স্বাধীনতালাভের পর এই আধুনিকতাকেই পাথেয় করে ফেলল।

আধুনিকতার অভ্যুদয় তো খ্রিস্টধর্ম পরম্পরার বিরুদ্ধে হয়েছিল কিন্তু বস্তুত সেটা ছিল সব ধর্মপরম্পরার প্রতি আঘাতস্বরূপ। আধুনিকতা প্রকটরূপে না হলেও প্রচ্ছন্নরূপে নাস্তিকতার পরিপোষক। মহাত্মা গান্ধী একে ঈশ্বরবিমুখ সভ্যতাও বলেছেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে এটা উল্লেখ করা যেতে পারে যে আধুনিক সভ্যতা প্রচারের পাশাপাশি এর নিন্দা তথা সমালোচনার স্বরও কম মুখর হয়েছে। ইউরোপ ও আমেরিকার অনেক দার্শনিক, কবি তথা সাহিত্যকারগণ যেমন এডমন্ড বর্ক, যোসেফ দ্য মেস্ত্রে, ইমার্সন, লিও দ্য টলস্টয়, সলঝেনিৎসন, এবিক বোগলিন, লিও স্ট্রাম, টিএম এলিয়ট, রেনে গেনো, ফ্রিথজোস সুআন আধুনিকতাকে সমূলে প্রত্যাখ্যান করেছেন। ভারতে মহাত্মা গান্ধী এবং ড. আনন্দ কুমারস্বামী আধুনিকতার আসুরিক স্বরূপের কট্টর সমালোচক ছিলেন। আধুনিক সভ্যতার মূল সিদ্ধান্তগুলোর প্রতি আঘাত হানতে গিয়ে মহাত্মা গান্ধী 'হিন্দ-স্বরাজ'-এ লিখেছেন যে ''এই সভ্যতার ধর্ম তথা নৈতিকতার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই। এদের ভক্তবা বলে থাকেন যে, তাদের কাজ ধর্মের শিক্ষা দেওয়া নয়। কেউ কেউ তো ধর্মকে নিরেট অন্ধবিশ্বাস বলে মনে করেন। আধুনিক সভ্যতা শারীরিক, সুখে বৃদ্ধির ওপর প্রতিষ্ঠিত কিন্তু তাতেও এটা পুরোপুরি ব্যর্থ।

এই সভ্যতা হচ্ছে নাস্তিক এবং ইউরোপের মানুষ এর মোহপাশে পাগলামির শিখরে জড়িয়ে পড়েছেন। বেশি কিছু নয়, একটু ধৈর্য ধরবার প্রয়োজন আছে। এটা নিজেই বিনষ্ট হয়ে যাবে। ইসলামের মান্যতা অনুযায়ী এটা হচ্ছে শয়তানী সভ্যতা, হিন্দু মান্যতা অনুযায়ী এটা হচ্ছে কলিকাল।"

আধুনিকতার মূল ভিত্তিগুলোকে নিম্নরূপে উপস্থাপন করা যেতে পারে—

১. মানুষকে জীব না মেনে স্রষ্টা বা কর্তব্য মানা।

২. জ্ঞানকে অনুভবাতীত, সনাতন, অন্তর্মুখী ও প্রতিবর্তী না মেনে মনুষ্যকৃত সঞ্চয়শীল, যুক্তিনির্ভর, প্রত্যক্ষবাদী ও যান্ত্রিক মান্য করা।

৩. নৈতিকতাকে দৈবিক বিধানের ওপর আশ্রিত না মেনে উপযোগিতা ও পরিস্থিতিজনিত বলে মনে করা।

৪. জীবনকে সামগ্রিকতাবাদী এবং আত্মবাদী বিবেচনা না করে ভৌতিকবাদী ও ব্যক্তিবাদী দৃষ্টিকে মানা।

৫. শিক্ষাকে সত্যোপলব্ধি ও চরিত্র গঠনের মাধ্যম মনে না করে শুধুমাত্র বৈষয়িক মানা।

৬. ন্যায়, স্বাধীনতা, সাম্যের ক্ষয়িষ্ণু ধারণাগুলোর ওপর তত্ত্বজ্ঞানের দৃষ্টিতে নয় বরং স্থূল দৃষ্টিতে দেখা।

৭. গুণসম্পন্নতার ওপর পরিমাণ ও সংখ্যাবলের প্রাধান্য।

৮. প্রকৃতিকে বিরাট পুরুষের শরীর না মেনে কার্যসাধনের উপায় মানা।

৯. রাজনীতিকে শক্তিকেন্দ্রিত, অর্থব্যবস্থাকে ভোগকেন্দ্রিত এবং সামাজিক সম্বন্ধগুলিকে মূলত অনুবন্ধাত্মক মানা।

১০. শিক্ষা

শিক্ষা মানুষের সঙ্গে নিঃশ্বাসের মতোই জড়িয়ে রয়েছে। ভালোই হোক আর মন্দই হোক শিক্ষা ছাড়া মানুষের জীবনের অস্তিত্বই নেই। সে চাক বা না চাক শিক্ষা না নিয়ে সে থাকতেই পারে না। এই জন্মে জীবনের জন্য যে মায়ের কোলে পদার্পণ করে এবং তার শেখা শুরু হয়ে যায়। সংস্কাররূপে সে শেখে। জন্ম নেবার সঙ্গে সঙ্গে তার শরীর ক্রিয়াশীল হয়ে যায়। সে প্রয়োজনে কিংবা অপ্রয়োজনে কিছু না কিছু করতেই থাকে। তার জ্ঞানেন্দ্রিয়ের ওপর বাহ্যিক পরিবেশ থেকে অসংখ্য অনুভূতি বোধ হতেই থাকে। সেগুলি থেকে না শিখে সে থাকতে পারে না। পারিপার্শ্বিক পরিবেশের সবকিছুর আচরণই তাকে শেখাতে থাকে। বিকশিত হওয়ার, বড়ো হওয়ার আন্তরিক ইচ্ছা ওকে ভেতর থেকেই কিছু না কিছু করবার ইচ্ছা ও প্রেরণা দিতেই থাকে। ভেতরের প্রেরণা আর বাইরের সম্পর্ক এমনি করে তার মানসিক পিণ্ড তৈরি করতেই থাকে। সে কেবল অনুভবই করে না, সে বিচার করে থাকে। এটা তার ক্রমবিকাশের পরিচায়ক। এটা হচ্ছে মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি।

পরমাত্মা মানুষকে শুধুমাত্র শরীরই দেননি। পরমাত্মা তাকে সক্রিয় অন্তঃকরণও দিয়েছেন। জিজ্ঞাসা হচ্ছে তার স্বভাবের লক্ষণ। সংস্কার গ্রহণ করা তার সহজাত প্রবৃত্তি। বিচার করতে থাকাও তার সহজাত প্রবৃত্তি। এসব আমি করছি, এটা আমার চাই, এটা আমার জন্য---এমন ভাবনা তার মধ্যে অহংকার জাগিয়ে তোলে, এসব তার শেখারই মাধ্যম। এগুলো সব আছে এর অর্থই হচ্ছে যে শেখাটা তার জন্য স্বাভাবিক ও অনিবার্য।

মানুষের এই স্বাভাবিক প্রবৃত্তিকেই মনীষীগণ শাস্ত্র বানিয়ে তাকে সুশৃঙ্খল করলেন। তার সহজাত প্রবৃত্তিকে অনুধাবন করলেন, তার লক্ষ্যকে জানলেন, সেই লক্ষ্যে উপনীত হবার পথে যে বাধাগুলো আসছে তা নিরূপণ করলেন এবং শিক্ষাকে প্রস্তুত করলেন। শিক্ষার মূর্ত প্রতীকরূপে তাঁরা শিক্ষাতত্ত্বের কল্পনা করলেন এবং ওই তত্ত্বকে বিভিন্ন ভূমিকায় স্থাপন করলেন। মাতা ব্যক্তির প্রথম গুরু, পিতা তার সঙ্গ দিলেন। আচার্যগণ তাকে শাস্ত্রজ্ঞান দিলেন, শাস্ত্রানুসারে আচরণ শেখালেন এবং ধর্মাচার্যগণ তার লোকশিক্ষকরূপে আজীবন শেখাতে লাগলেন। শিক্ষাকে মনীষীগণ প্রেরণা, পথপ্রদর্শক, উপদেশ, সংস্কার ইত্যাদি অনেক নাম দিলেন এবং অনেক স্বরূপ প্রদান করলেন। তাঁরা শিক্ষার কতকগুলো বিশিষ্ট অভিমুখ নির্দিষ্ট করলেন। এগুলো হচ্ছে—

শিক্ষা হচ্ছে মানুষের বৈশিষ্ট্য।
শিক্ষার লক্ষ্য হচ্ছে জ্ঞানলাভ করা।
শিক্ষার মূল হচ্ছে জিজ্ঞাসা।
শিক্ষা হচ্ছে আজীবন চলমান প্রক্রিয়া।
শিক্ষা সর্বত্র হয়ে থাকে।
শিক্ষা হচ্ছে সবার জন্য।
শিক্ষা ধর্ম শেখায়।
শিক্ষা সব প্রশ্নের উত্তর জ্ঞানাত্মক পথে ব্যাখ্যা করবার জন্য হয়।
শিক্ষা মুক্তির পথে চালিত করে থাকে।

এই হচ্ছে শিক্ষার ভারতীয় দর্শন। ভারতে এরই অনুসরণে শিক্ষা চলে আসছে। প্রত্যেক যুগে, প্রত্যেক পরম্পারাতে শিক্ষক ও চিন্তকগণের নিজ নিজ পদ্ধতিতে একে বুঝতে হয় এবং নিজের বর্তমান আবশ্যকতানুযায়ী একে গড়তে হয়। প্রকৃতি পরিবর্তনশীল, এজন্য ব্যবস্থাদিতে পরিবর্তন হতে থাকে। তত্ত্বকে অপরিবর্তনীয় রেখেই এই পরিবর্তন করতে হয়। কিন্তু বর্তমান সময়ে ভারতে যে পরিবর্তন হয়েছে তা স্বাভাবিক নয়। এই পরিবর্তন এমন হয়েছে যে, একে অভারতীয় বলবার জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে। শিক্ষার অভারতীয়করণ দুই শতাব্দী ধরে চলে আসছে। যখন এর প্রারম্ভ হলো তখন একে রোখার প্রয়াস যে হয়নি তা নয়, কিন্তু দৈব দুর্বিলাসের থেকে তাকে রক্ষা করা খুব একটা সম্ভব হয়নি। আজ অভারতীয়করণ ভারতের মুখ্য ধারার শিক্ষায় ভেতর-বাহির সব গুলিয়ে গিয়েছে। এই গুলিয়ে যাওয়াটা এমন যে শিক্ষার অভারতীয়করণ যে হচ্ছে তা সাধারণ মানুষ এবং অভিজাত মানুষের বোধগম্যের মধ্যেই আসছে না। দেশ সেই অনুসারেই চলছে। একে যুগানুকূল পরিবর্তন বলা যাবে না, কারণ রাষ্ট্রীয় জীবনের সব সংকটই তা থেকে জন্ম নেয়। এজন্যই শিক্ষার ভারতীয়করণের বিষয়টা খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে পড়েছে।

মুখ্য প্রবাহের শিক্ষা অভারতীয় হলেও দেশের বিভিন্ন স্তরে এটা ঠিক হচ্ছে না এমন ধারণা ধীরে ধীরে বলবান হচ্ছে। এ থেকেই মূল্যশিক্ষার বিষয় প্রভাবশালী হয়ে চলেছে। এখন শিক্ষাক্ষেত্রেও ভারতীয় ও অভারতীয় আলোচনা শুরু হয়ে গেছে। যদিও এই কাজটা কঠিন এমনটাই সকলের ধারণা তথাপি এর প্রয়োজনীয়তাও সকলের কাছে অনুভূত হচ্ছে। সরকার থেকে থেকে শুরু করে ছোটো বড়ো সংস্থাগুলোতেও ভারতীয়করণের বিষয়ে চিন্তাভাবনা চলছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয় শিক্ষার আদ্যোপান্ত আলোচনার প্রয়োজন। কোথাও বর্তমান বিষয় ছেড়ে কোথাও একে নিয়ে তত্ত্বের পরিবর্তন না করে নতুন করে গঠন কী করে করা যায় সেই নীতি নিয়ে এখানে চিন্তাভাবনার প্রয়োজন আছে। *(ক্রমশ)*

ভাষান্তর : সূর্য প্রকাশ গুপ্ত (প্রাক্তন অধ্যাপক)

হিন্দুত্ব ও ভারতবর্ষ

রঞ্জন কুমার মণ্ডল

পরাধীন ভারতবর্ষেই ধর্মনিরপেক্ষ নামক এক অশ্বডিম্ব নিয়ে মাতামাতি শুরু হয়েছিল। এক সাগর রক্তের বিনিময়ে স্বাধীনতা নামক শাসক বদল করেও আশা পূরণ হলো না হিন্দুস্থানের। উলটে হিন্দুত্ব নিয়ে মিথ্যাচার অবাধে স্থান পেল, শিল্প সাহিত্য চলচ্চিত্র থেকে শুরু করে বিকৃত ইতিহাসের পৃষ্ঠাতে। স্বাধীনতার এত বছর অতিক্রম করেও ভারতবর্ষ ডুবছে সেই মিথ্যাচারের চোরাবালিতে। এই বিষয়কে সম্বল করেই হিন্দুত্ব ও ভারতবর্ষ সম্পর্কে একটা সংকেত দিতে চেষ্টা করব।

প্রাচীনকাল থেকেই ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির ধারা প্রবাহিত হয়েছে বেদ, উপনিষদ, পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারতের মধ্যে দিয়ে। ধীরে ধীরে এই সংস্কৃতির নাম হয়ে উঠেছিল হিন্দু। ভৌগোলিক দিক থেকে এর যে প্রসিদ্ধি তাতে ভারতীয়ত্ব ও হিন্দুত্ব হয়ে উঠল সমার্থক। ড. রাধাকৃষ্ণনের কথাতে তো স্পষ্ট হয়ে উঠেছে— "The term HINDU had originally a territorial and not a credal significance. It implied tesidence in a well-defined geographical area. Aboriginal tribs, savage and half-civilized people, the cultured Dravidians and the Vedic Aryans were all 'Hindu's as they were the son of the same/ mother." (The Hindu views of life-page-3)

হিন্দুত্বের কথা শুনলেই যাদের হৃদযন্ত্রের গতি বেড়ে যায়, কিংবা আতঙ্কিত ও জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়েন, তাদের জানতে হবে যে, হিন্দুত্বের মধ্যে কোথাও সংকীর্ণতা ও সাম্প্রদায়িকতার স্থান নেই। 'হীনং দুয়য়তি— ইতি হিন্দু' অর্থাৎ হীন কর্মকে যারা দোষের মনে করেন তারাই হিন্দু। অন্যদিকে হিন্দু শব্দের ইংরেজি HINDU অর্থ H= Humanity বা মানবতাবাদ, I=Integrity বা অখণ্ডতা সততা ও ন্যায়পরায়ণতা, N=Nationality বা জাতীয়তা ও স্বদেশপ্রিয়তা, D= Divinity বা পবিত্রতা বা দেবত্ব , U=Unity বা একতা ও সাম্য।

● প্রসঙ্গত বলা প্রয়োজন, ধর্ম হলো জীবনাচরণ পদ্ধতি। সংস্কৃত ধৃ অর্থ ধারণ। সমাজ বা জীবের মঙ্গলার্থে যা কিছু শুভ ও মঙ্গলময় ধারণ বা গ্রহণ করা হয় তা-ই ধর্ম। একই ভাবে বিপরীতে অমঙ্গল সাধনের নিমিত্ত ধারণ বা গ্রহণ করা হয় তা-ই অধর্ম। হিন্দু ধর্ম বা হিন্দুত্ব ঠিক তেমনি এক সনাতন রীতি— যা ভারত ভূখণ্ড সহ সমগ্র মানবজাতির সর্বাঙ্গীণ মঙ্গলার্থে যুগ যুগ ধরে গৃহীত হয়েছে। সেই সঙ্গে যখনই কোনো পদ্ধতি বা আচরণ বা প্রথা ত্রুটিপূর্ণ প্রমাণ হয়েছে তখনই তা পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও সংস্কারিত হয়েছে। তাইতো হিন্দু সভ্যতা যুগ যুগ ধরে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

● হিন্দুত্বের বিরূপ সমালোচকগণ নানা প্রাচীন প্রথার উদাহরণ তুলে ধরে হিন্দুত্বের কলঙ্ক প্রকাশ করার মধ্যে তৃপ্তি পান। কিন্তু তারা ভুলে গেছেন (নাকি ইচ্ছা করেই ভুল করেন) প্রকৃতির লীলাভূমিতে সবকিছুই প্রয়োজনভিত্তিক চলতে থাকে। কালের পরিবর্তন সেই প্রয়োজনকেও পরিবর্তিত করে নতুন পথের দিশারি করে তোলে। অর্থাৎ প্রাচীন অপ্রয়োজনীয় রীতিনীতি বা প্রথা-পদ্ধতি বাতিল করে, যুগোপযোগী করে তোলে। এই শাশ্বত সত্যই ভারতবর্ষের ঐতিহ্য ও বিশেষত্ব। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়— সতীদাহপ্রথা, বিধবাবিবাহ, বাল্যবিবাহ-সহ অসংখ্য প্রথা পরিবর্তনের ঘটনাসমূহ তারই প্রমাণ। অথচ এসব প্রাচীন প্রথা সমকালে সামাজিক প্রয়োজন ব্যাতিরেকে সৃষ্টিই হতো না। তাইতো অকূল দরিয়ায় মাঝি গেয়ে চলে 'নদীর একূল ভাঙে, ওকূল গড়ে, এই তো নদীর খেলা।' আবার বর্তমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সুবর্ণযুগে অতীতের পালকি, গোরুর গাড়ি কিংবা খবরের বোঝা হাতে রানারের কথা কল্পনাও করতে চাইবে না বর্তমান বিশ্ব। স্থানাভাবে এর বিস্তৃত ব্যাখ্যা সম্ভব না হলেও পণ্ডিতজন তা অনুধাবন করতে পারছেন নিশ্চয়ই। পূর্বেই বলা হয়েছে— ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতি ও জীবনাদর্শের নাম হিন্দুত্ব। হিন্দু কোনো বিশেষ উপাসনা পদ্ধতি নয়, এর পরিচয় ইতিহাসের মধ্যে। এই ইতিহাস

শুধু হত্যা, লুণ্ঠন, ধ্বংস, জয়-পরাজয় অথবা প্রেম কাহিনির কল্পনা বিলাস নয়।

ধর্মার্থকামমোক্ষানামুপদেশ সমন্বিতম।
পূর্ব্ববৃত্তকথাযুক্তমিতিহাসং প্রচক্ষতে।।

—এই সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করলেই আমাদের বক্তব্যের সমর্থন মিলবে।

তবু বর্তমানে মেকি ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের চিৎকার শুরু হয়েছে, রব উঠেছে গেল-গেল, দিকে দিকে প্রশ্ন উঠেছে কেন? কেন? কেন? আমাদের কাছে এর উত্তর খুবই সোজা। হাজার বছর ধরে (১১৯২ খ্রিস্টাব্দে তরাইনের যুদ্ধের বহু পূর্বে) বারে বারে যে অত্যাচার, লুণ্ঠন, ধ্বংসলীলা হিন্দুস্তানের উপর চালানো হয়েছিল এবং এখনও হয়ে চলেছে, তার কোনো প্রলেপ, সুবিচার, সহমর্মিতা অথবা ক্ষতিপূরণের সদিচ্ছা কোনোদিন, কোনোদিক থেকেই লক্ষ্য করা যায়নি। সে ধর্মস্থান ধ্বংস, নালদা বিশ্ববিদ্যালয় ধ্বংস, রক্তের হোলি খেলা, ধর্মান্তরকরণ নামক কৌশলই হোক অথবা সংবিধানর নামে (১৯৫০ খ্রি.) বিসদৃশ দুমুখো নিয়ম হোক না কেন— প্রকৃত ভারতীয় সমাজের মর্মকথাকে কেউ অনুধাবনও করেননি, গুরুত্বও দেননি। কালের নিয়মে কখনও কখনও গুরু তেগবাহাদুর, মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য, স্বামী বিবেকানন্দ, প্রণবানন্দ মহারাজ, শঙ্করাচার্য, নানক, কবীর প্রমুখ মহাপুরুষ প্রতিবাদ, প্রতিরোধ, উপদেশ দিয়ে তাঁদের কর্মযোগের বিস্তার ঘটিয়েছেন স্ব স্ব কর্মক্ষেত্রে। এঁদের প্রত্যেকের কথাতেই পাওয়া যায়— ধর্মই ভারতীয় জীবনের মূল ভিত্তি। কিন্তু তাকে সুরক্ষিত রাখার দায়িত্ব ভারতীয় তথা হিন্দু সমাজের। অথচ সমাজের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ যদি সে দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হন— তবে তো উত্তরসূরিদের দায়িত্ব নিতেই হবে।

সর্বোপরি 'ভারত আবার জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে'। একথা সত্য প্রতিপন্ন করতে হলে কিংবা এই আসন পেতে হলে হিন্দু, সভ্যতা- সংস্কৃতির পুনরুত্থান প্রয়োজন। একথা বারে বারে প্রমাণিত। কারণ ধর্ম না থাকলে সমাজের ভিত্তিস্তম্ভ ধ্বংস হয়ে যাবে। স্বামীজীর কথায়— 'If you struch out religion from the society, what will remain? Nothing but brute.' তাই, 'আহার নিদ্রা ভয় মৈথুনঞ্চ সামান্য মেতৎপশুভির্নরানাম্/ ধর্মো হি তেষামধিকো বিশেষো, ধর্মেন হীনা পশুভিসমানা'। তাই আসুন হে ধর্মপিপাসু, হিন্দুত্ববাদী ভারতীয় নরনারীগণ, উপাসনা পদ্ধতির বিবিধের মধ্যে মিলনের ব্রত নিয়ে, ভারতীয়ত্ব বা হিন্দুত্বের গৌরবোজ্জ্বল অতীতকে সম্বল করে বর্তমানের গ্লানিময়তা অতিক্রম করে, ভারতের ভবিষ্যৎ ইতিহাস সৃষ্টি করি উত্তরসূরিদের জন্য। 'চলে যেতে হবে আমাদের। চলে যাব, তবু যতক্ষণ দেহে আছে প্রাণ, প্রাণপণে পৃথিবীর সরাব জঞ্জাল'। বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের চিকাগো ধর্ম মহাসম্মেলনে বক্তৃতার ১২৫তম বর্ষ পূর্তিতে (১১ সেপ্টেম্বর ১৮৯৩) তাঁর কথা দিয়েই এই বিষয়ে ইতি টানা যায়— 'গর্বের সঙ্গে বলো— আমি হিন্দু' ■

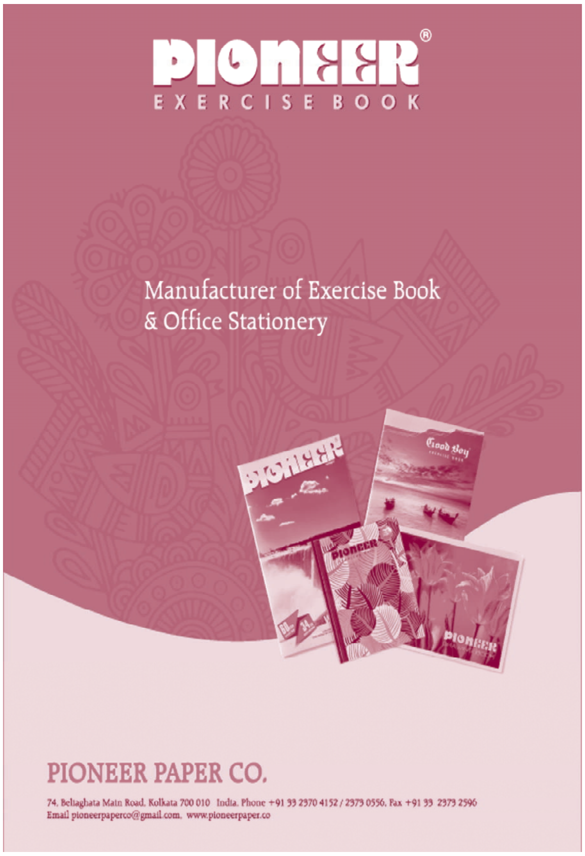

মোদীজীর মতো সৎ প্রধানমন্ত্রী ভাগ্যের ও গর্বের বিষয়

মণীন্দ্রনাথ সাহা

সম্প্রতি খবরে জানা গেছে যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নিজের সঞ্চয় ও উপহারে পাওয়া সামগ্রী নিলাম করে ১০৩ কোটি টাকা বিভিন্ন প্রকল্পে দান করেছেন। পিএম কেয়ার্স ফান্ডেও সবার প্রথম তিনিই ২.২৫ লক্ষ টাকা দান করেন। প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের এক অফিসার জানিয়েছেন— প্রধানমন্ত্রী আগেও বহু ক্ষেত্রে দান করেছেন। যেমন— শিশু কন্যাদের কল্যাণে, গঙ্গা নির্মল করার প্রকল্পে এবং পিছিয়েপড়া মানুষজনের প্রয়োজনে অতীতে তিনি অনুদান দিয়েছেন। এখনও পর্যন্ত তিনি যে অর্থ দান করেছেন, তার মোট পরিমাণ ১০৩ কোটি টাকার বেশি।

পিএমও-র তরফে জানানো হয়, গত বছরই উত্তরপ্রদেশের প্রয়াগরাজে কুম্ভমেলার সাফাই কর্মীদের জীবনযাত্রার উন্নয়নের স্বার্থে নিজের জমানো টাকা থেকে ২১ লক্ষ টাকা দান করেছেন প্রধানমন্ত্রী। দক্ষিণ কোরিয়ায় সিওল শান্তি পুরস্কার পাওয়ার পর সেই মূল্য ১.৩ কোটি টাকাও গঙ্গা সংস্কারের কাজে দান করেছেন তিনি। এছাড়াও নিজের মেমেন্টো ও নানা পুরস্কার মূল্য বাবদ ৩.৪০ কোটি টাকা, একবার ৮.৩৫ কোটি টাকা দান করেছেন তিনি, যা নমামি গঙ্গে মিশনে বরাদ্দ হয়েছে।

শুধুমাত্র প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নয়, গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন নিজের জমানো টাকা থেকে ২১ লক্ষ টাকা তিনি গুজরাটের সরকারি কর্মচারীদের কন্যার শিক্ষার জন্য দান করেছেন। সেই সময় সমস্ত উপহার ও পুরস্কার মূল্য বাবদ ৮৯.৯৬ কোটি টাকা ‘কন্যা কেলাবনী’ ফান্ডে দান করেন।

অথচ কংগ্রেস ও অন্যান্য দলগুলি পিএম কেয়ার্স ফান্ডের আইনগত বৈধতা নিয়েও বারবার প্রশ্ন তোলে। প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী পি. চিদম্বরম এই তহবিলে দাতাদের তালিকা জানতে চান। তারই পরিপ্রেক্ষিতে জানানো হয় দাতাদের তালিকায় আছেন প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং।

এই তহবিলে দাতাদের নামের তালিকা পি. চিদম্বরমের জানতে চাওয়া সম্পর্কে একটা ঘটনার কথা মনে পড়ছে। এক শেষ রাত্রিতে রাস্তায় একজন লোক অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে। সেই সময় এক মাতাল ওই লোকের পাশ দিয়ে যাবার সময় লোকটিকে উদ্দেশ্য করে বলল— ‘বাবা একটু কম করে খেলেই তো পারিস। খাবি তো মাতাল হবি কেন? দেখ্ আমি তো মাতাল হইনি। এখন থেকে কম করে খাবি বুঝলি’, বলেই টলতে টলতে চলে গেল। এর একটু পরেই এক চোর চুরি করে বাড়ি ফেরার পথে লোকটিকে রাস্তায় পড়ে থাকতে দেখে বলল— ‘দেখ্ শালা, চুরি করে পালানোর সময় ধরা পড়ে প্যাঁদানি খেয়েছিস তো। আর কখনো চুরি করতে যাবি না। শালা চোর’... বলেই লোকটিকে লাথি মেরে চলে গেল। তার কিছুক্ষণ পরেই এক কৃষ্ণভক্ত কৃষ্ণনাম করতে করতে যাওয়ার সময় লোকটিকে পড়ে থাকতে দেখে বলল— ‘আহা-হা বেচারি কৃষ্ণ প্রেমে বেহুঁস হয়ে পড়ে আছে। তুমিই সত্যিকারের কৃষ্ণভক্ত।’ এই বলে অচৈতন্য লোকটিকে তুলে নিয়ে কাছেই এক মন্দিরের বারান্দায় শুয়ে দিয়ে চলে গেল। প্রাক্তন অর্থমন্ত্রীকে এই তিনজনের মধ্যে কার সঙ্গে তুলনা করা যাবে তা পাঠক স্থির করবেন।

আমাদের দেশে রাজনীতি যেখানে

লুটেপুটে খাওয়ার শ্রেষ্ঠ পথ সেখানে সৎ ব্যক্তিরা ভালো কিছু করলেও লুঠেরারা তা বাঁকা চোখে দেখে। জাতীয় কংগ্রেসের নেতাদের মধ্যে বিশেষ করে নেহরু পরিবারের গায়ে এত দুর্গন্ধযুক্ত কাদা লেগে আছে যে তা দমকলের পাইপের জল দিয়ে ধুয়েও পরিষ্কার করা যাবে না। অথচ ওই দলের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী প্রয়াত লালবাহাদুর শাস্ত্রী, পিভি নরসিমহা রাও, আই কে গুজরাল ও আরও দু-একজনের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষ তো দূরের কথা কট্টর কংগ্রেস বিরোধীরাও কোনোদিন আঙুল তোলেননি বা তুলতে পারেননি। স্বাধীন ভারতের সবচেয়ে বেশি ক্ষতি যদি কেউ করে থাকেন, তিনি হলেন দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী। স্বাধীন ভারতে আর্থিক দুর্নীতিও তাঁর হাত ধরে প্রচলন হয়। শুধু তিনি নন, তাঁর অধস্তন বংশধরগণের প্রত্যেকের গায়েই দুর্নীতির দুর্গন্ধ জমাট বেঁধে আছে। আর সেই দলের কিছু নেতা বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর মতো আদ্যন্ত সৎ মানুষের কাজে সন্দেহ প্রকাশ করছেন।

শুধু প্রধানমন্ত্রীই বা বলি কেন। প্রধানমন্ত্রীর পরিবারের মতো সৎ পরিবার খুব কমই আছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর পরিবারটির দিকে দেখলেই বোঝা যাবে— আমগাছে আম-ই ভলে, আমড়া ফলে না। অপরদিকে আমড়াগাছে আমড়াই ফলে, সুস্বাদু ল্যাংড়া আম ফলে না। দয়া করে একটু ধৈর্য ধরে নরেন্দ্র মোদীর পরিবারের কয়েকটি অবিশ্বাস্য তথ্য নিন্দুকরা জেনে নিন।

১. সোমভাই— ৭৬ বছর, অবসরপ্রাপ্ত স্বাস্থ্য আধিকারিক, আশ্রমে থাকেন।

২. অমৃতভাই— ৭৩ বছর, বেসরকারি কোম্পানির অবসরপ্রাপ্ত শ্রমিক।

৩. প্রহ্লাদ— ৬৫ বছর, রেশন দোকানের মালিক।

৪. পঙ্কজ— ৫৯ বছর, তথ্যদপ্তরে কর্মরত।

৫. ভোগীলাল— ৬৮ বছর, একটি ছোটো মুদি দোকানের মালিক।

৬. অরবিন্দ— ৬৫ বছর, জাংকফুডের দোকানে কর্মরত।

৭. ভরত— ৫৬ বছর, পেট্রলপাম্পের অ্যাটেনডেন্ট।

৮. অশোক— ৫২ বছর, ঘুড়ি ও মুদির দোকান চালান।

৯. চন্দ্রকান্ত— ৪৯ বছর, গোশালার শ্রমিক। এই নয়জনের মধ্যে প্রথম চারজন মোদীজীর নিজের ভাই। পরের জনেরা মোদীর কাকা নরসিংহদাস মোদীর ছেলে। মোদীজীর এক বউদিকে দেখা যায় ওয়ারেনগরের কান্তা মার্কেটের কাছে একটি ছোট্ট খাবারের দোকান চালাচ্ছেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ভারতের সবচেয়ে ধনী রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন ১২ বছর, দেশের প্রধানমন্ত্রীর পদে ছয় বছর পার করেছেন। নিজের জন্য কোনো কিছু না গুছিয়ে বরং তাঁর বেতন এবং পুরস্কার পাওয়া অর্থ বিলিয়ে দিচ্ছেন দেশের স্বার্থে। কিন্তু তাঁর বিরুদ্ধে অনেকেই গোপন স্বার্থ দেখতে পান, যা আদপে সর্বৈব মিথ্যা।

মোদীর মতো প্রধানমন্ত্রী যদি আমাদের দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে না পারেন তাহলে আর কে পারবে? মোদীজীর মতো সৎ, কর্মঠ এবং সহসী প্রধানমন্ত্রী পাওয়া ভারতবাসীর ভাগ্যের ও গর্বের বিষয়। ■

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার
যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩

শিতাংশু গুহ

গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের ডাক্তার জাফরুল্লাহ চৌধুরীর বিরুদ্ধে ঢাকায় একটি মামলা হয়েছে। এমনিতে কারো বিরুদ্ধে মামলা হবে, এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই, হতেই পারে। কিন্তু এ মামলার একটি বিশেষত্ব আছে। মামলাটি হয়েছে ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত দেওয়ার জন্যে। ডাঃ জাফরুল্লাহ মুসলমান। যিনি মামলা করেছেন। তিনি হিন্দু। নাম স্মৃতিকণা বিশ্বাস। ভদ্রমহিলার সাহস আছে বটে! কোনো পুরুষ বা কোনো হিন্দু ধর্মীয় সংগঠন যখন এগিয়ে আসেনি, তখন তিনি সাহস করে মামলাটি করেছেন। মিডিয়া বলছে, স্মৃতিকণা ঢাকা ভার্সিটি ছাত্রলিগের সাবেক নেত্রী। জানা যায়, ১৯৯৪ সালে তিনি বরিশালে বিএনপি-জামাত কর্তৃক নিগৃহীত হয়েছিলেন। ডাক্তার জাফরুল্লাহ চৌধুরীর মামলা খেয়ে অভ্যাস আছে। এতে তিনি ঘাবড়ে যাবার পাত্র নন! দেখা যাক, ডাক্তার জাফরুল্লাহ চৌধুরী

স্মৃতিকণা বিশ্বাসের সাহস আছে বটে!

ভার্সেস স্মৃতিকণা বিশ্বাস মামলার শেষ কী দাঁড়ায়?

কেন এই মামলা? ৯ আগস্ট রবিবার জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে ভাসানী অনুসারী পরিষদ আয়োজিত এক প্রতিবাদ সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে ডাঃ জাফরুল্লাহ বলেছেন, ‘ভারতের মুসলমানরা গত ঈদে গোরুর মাংস খেতে পারেনি। অথচ নরেন্দ্র মোদীর পূর্বপুরুষরা গোরুর মাংস খেতো।’ তিনি আরও বলেছেন, ‘রাম চরিত্রটি কাল্পনিক। মহাভারত ও রামায়ণ মিথ্যাচারের কল্পকাহিনি।’ এখানেই তিনি থেমে যাননি, বরং আরও একধাপ এগিয়ে বিদেশমন্ত্রীর একটি কথার প্রেক্ষিতে বলেছেন, ‘বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক রক্তের ঠিকই, তবে এ রক্ত দূষিত, তা পরিচ্ছন্ন করা দরকার।’ স্পষ্টত, ডাক্তার চৌধুরীর বক্তব্য হিন্দু ও ভারত বিদ্বেষ থেকে উৎসারিত। কোনো হিন্দু বা এমনকী কোনো মুসলমান যদি ইসলাম নিয়ে এ ধরনের আপত্তিকর কথাবার্তা বলতেন, তাহলে নির্ঘাত ডিজিটাল আইনে জেলে থাকতেন এবং মোল্লারা ফাঁসির দাবিতে রাস্তায় নামতেন।

দেশের হিন্দু ও অন্য সংখ্যালঘুরা প্রায়শ অভিযোগ করেন যে, ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত শুধু একটি ধর্মের মানুষের লাগে, অন্যদের লাগতে নেই? নইলে ডাঃ জাফরুল্লাহ চৌধুরীর এ বক্তব্যের জন্যে জেলে যেতেন। কিন্তু তিনি বহাল তবিয়তে আছেন। সরকার নির্বিকার, ডিজিটাল আইন এখানে প্রযোজ্য নয়। সরকার মামলা না করার ফলে একজন মহিলা সরকারের এ দায়িত্বটি পালন করেছেন। আদালত মামলাটি নিতে চাননি, সরকারের অনুমতি আনতে বলেছিলেন। একদিন পর মামলা গৃহীত হয়েছে। আদালত তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন। ডিবি তদন্ত করছেন। এখন দেখার বিষয় তাঁরা মামলা কোনদিকে নিয়ে যান! এ সময়ে কোনো সংস্থার প্রতি মানুষের আস্থা কম, ঠিকমতো তদন্ত হবে তো? হওয়া উচিত। সাধারণ মানুষের আস্থা ফিরিয়ে আনাটা দরকার। আইনকে আপন নিয়মে চলতে দেওয়া প্রয়োজন। হোক না ডাক্তার চৌধুরী স্বনামধন্য ব্যক্তি।

ডাক্তার চৌধুরীকে কিছু লোক পাগল

বলে। অতি মেধাবী ও স্মার্টরা অনেক সময় তাই হন। তবে তিনি ‘জাতে পাগল তালে ঠিক’। বাংলাদেশে প্রায় প্রতিদিন মুর্তি ভাঙা হয়, পুলিশ মাঝে-মধ্যে এদের ধরে এবং পরে ‘পাগল’ সার্টিফিকেট দিয়ে ছেড়ে দেয়। এই পাগলদের মতো ডাক্তার জাফরুল্লাহ চৌধুরীর মতো পাগলের যথেষ্ট মিল আছে। সাধারণ পাগলরা মুর্তি ভাঙে, মন্দির ভাঙে কিন্তু মসজিদ ভাঙে না, কারণ তাঁরা জানে, তাহলে ‘কিলঘুষি’ একটাও মাটিতে পড়বে না। জাফরুল্লাহ চৌধুরীও তা জানেন, তাই সুযোগ বুঝে হিন্দু ধর্মের বিরুদ্ধে বলেছেন। সাধারণত, হিন্দুরা সুবোধ বালক, কাউকে মারতে যায় না। মামলা করে না। এবার ব্যতিক্রম, ডাঃ চৌধুরীর কপাল খারাপ, মামলা হয়েছে। চট্টগ্রামেও একটি মামলা হয়েছে। যে কেউ স্বীকার করবেন, ডাক্তার জাফরুল্লাহ চৌধুরীর বক্তব্যটি সাম্প্রদায়িক এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। মামলাটি তাই যথার্থ।

অতীতে ডাক্তার চৌধুরী জাসদ-এর রাজনীতি করতেন। তিনি বিএনপি ঘরানার মানুষ। জাসদের জন্ম বঙ্গবন্ধুর বিরোধিতার জন্যে। অথচ বঙ্গবন্ধুর আশীর্বাদেই ডাক্তার চৌধুরী প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন। জন্মলগ্নে জাসদে রাজাকার ও ধর্মান্ধ গোষ্ঠীর ঠাঁই হয়, ডাঃ চৌধুরী সেই গ্রুপের মানুষ ছিলেন না। যদিও কিছু মুক্তিযোদ্ধা সময়ের ব্যবধানে রাজাকার হয়েছেন এমন দৃষ্টান্ত ভুরিভুরি। হয়তো তাই তিনি ভাসানী গ্রুপের প্রধান অতিথি ছিলেন। এই গ্রুপ অসাম্প্রদায়িক তা বিশ্বাস করতে কষ্ট হয় বই কী! ডাক্তার চৌধুরী গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র দিয়ে বিখ্যাত। গণস্বাস্থ্য নামটি বঙ্গবন্ধুর পছন্দের এবং ১৯৭২ সালে তিনি ২৩ একর জমি দিয়েছেন। ডাক্তার চৌধুরী কি ‘রাষ্ট্রের ধনে’ পোদ্দারি করছেন না? স্বীকার্য যে, স্বাধীনতা যুদ্ধে তার ভূমিকা উজ্জ্বল। পরবর্তীতে তাঁর রাজনৈতিক অধ:পতন ঘটেছে। বর্তমানে তিনি হয়তো ‘বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র ও ইসলামিতন্ত্র’ একত্রে গুলিয়ে ফেলেছেন।

একদা তাঁর বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহের মামলা হয়েছিল। তিনি ক্ষমা চেয়ে বেঁচেছেন। ২০১৫-তে আইসিটি কোর্ট তাঁকে এক ঘণ্টার দণ্ডাদেশ দেন, সঙ্গে ৫ হাজার টাকা জরিমানা। এবার কী হবে? আমার ধারণায়, ‘যারা ভারত বিরোধী তাঁরা হিন্দু বিরোধী ও সাম্প্রদায়িক’। এটি কাউকে মানতে হবে এমন নয়, তবে মিলিয়ে দেখতে পারেন। এরা ভারত ও হিন্দুকে সমান্তরাল লাইনে দেখেন! ডাঃ জাফরউল্লাহ চৌধুরী কি তাই? তিনি হিন্দুদের বিরুদ্ধে বললে কিচ্ছু আসতো-যেতো না, দু’হাজার বছর ধরে তা অনেকেই বলছেন। সমস্যা হচ্ছে, তিনি এসব কথা বলে একটি ধর্মান্ধ গ্রুপকে সুড়সুড়ি দিতে চেয়েছেন। সামাজিক মাধ্যমে যারা তাঁর পক্ষে সাফাই গাইছেন, তাঁরা মোটামুটি সবাই অ্যান্টি-আওয়ামী লিগ এবং অনেকে স্বাধীনতা বিরোধী। সঙ্গত কারণেই এঁরা স্মৃতিকণা বিশ্বাসকে ভারত ও আওয়ামীর দালাল বলে অভিহিত করছেন।

জানা যায়, স্মৃতিকণা বিশ্বাসকে হুমকি দেওয়া হচ্ছে। তাকে মামলাটি প্রত্যাহারের জন্যে চাপ দেওয়া হচ্ছে। তিনি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সাহায্য চেয়েছেন। যে কোনো আইনমান্যকারী নাগরিক চাইবেন, এই মামলার সুষ্ঠু তদন্ত হোক। মামলা আদালতে উঠুক। ডাক্তার জাফরুল্লাহ চৌধুরী ভার্সেস স্মৃতিকণা বিশ্বাস মামলা জনগণ দেখুক। বিবাদী আত্মপক্ষ সমর্থন করে কথা বলুক এবং দোষ স্বীকার করে আদালতের কাছে ‘ক্ষমা’ ভিক্ষে করুক। আদালত তাঁকে ক্ষমা করে দিতেও পারেন। বাদী নিশ্চয় এই ৭৮ বছরের বৃদ্ধ ভদ্রলোকের প্রতি সহানুভূতিশীল হবেন। এই মামলায় ডাক্তার চৌধুরীর শাস্তি হলে অন্যরা ভবিষ্যতে ধর্ম নিয়ে গালাগালি করতে সাহস পাবেন না। বাদী স্মৃতিকণা বিশ্বাসও হয়তো তাই চাচ্ছেন, দেশে ধর্ম নিয়ে আবোলতাবোল কথাবার্তা বন্ধ হোক। বিলাতে পড়াশোনা করা একজন বিজ্ঞ ডাক্তার চৌধুরীর কঠিন সাজা হোক, তা হয়তো কাম্য নয়, কিন্তু ‘বারবার ঘুঘু খেয়ে যাবে ধান’ তা তো হয় না?

(লেখক নিউইয়র্ক প্রবাসী বাংলাদেশি)

SURYA
Energising Lifestyles
Innovative
DESIGN
World-Class Quality
PRODUCTS
Just One Name
SURYA
lighting
fans
appliances
pipes
SURYA ROSHNI LIMITED
E-mail: consumercare@sroshni.com I www.surya.co.in
Tel.: +91-11-47108000, 25810093-96
Toll Free No.: 1800 102 5657
/suryalighting I /surya_roshni